Original : PEKA MEDALU *(Telugu)*

সচিব ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নিউ দিল্লী-১৬ কর্তৃক প্রকাশিত
এবং নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-৪ দ্বারা মুদ্রিত।

প্রস্তাবনা

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। সংস্কৃতির দিক দিয়ে অভিন্ন হলেও একটি শক্তিশালী প্রগতি সম্পন্ন রাষ্ট্ররূপে একে গড়ে তুলতে হলে সব দিক দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।

বহু ভাষার দেশ এই ভারতবর্ষ। প্রত্যেক প্রদেশের ভাষা বিভিন্ন। পৃথিবীর অন্য সব দেশের চাইতে আমাদের দেশের ভাষার সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশগুলির ভাষা শেখবার বা জানবার জন্যে কোনও আগ্রহ অনুভব করি না। অন্যান্য প্রদেশের সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পদের বিষয়ে আমরা একেবারেই অজ্ঞ। ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জার্ম্মান ইত্যাদি য়ুরোপীয় ভাষার সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান আছে তার তুলনায় নিজেদের প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক সীমিত।

দেশের ভাবাত্মক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাহিত্যের মাধ্যমেই অন্যান্য প্রদেশের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

পাশ্চাত্য দেশে রাষ্ট্রের সংখ্যা অনেক। তারা সবাই স্বাধীন। রাষ্ট্রের ভাষাও আলাদা আলাদা। ওখানকার লোকেদের পরস্পরের সাহিত্য ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে যত গভীর জ্ঞান আছে তা আমাদের নিজেদের ভাষাগুলি সম্বন্ধে নেই। এ এক অদ্ভুত বৈষম্য। য়ুরোপের সব ভাষার শ্রেষ্ঠ বইগুলি অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ভারতবর্ষ এক অভিন্ন রাষ্ট্র অথচ এখানে একে অন্যের ভাষা জানবার কোনও কৌতূহলই বোধ করেনা। অবশ্য ঐ পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করেছে যদিও পরিবর্তনের গতি খুবই মন্থর।

এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই ভারত সরকার প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ সমসাময়িক সাহিত্য গ্রন্থগুলি অন্যান্য সব ভাষায় অনুবাদ

করার পরিকল্পনা করেছেন। এর জন্য এমন সব বই বেছে নেওয়া হবে যেগুলি সাধারণ পাঠকের রুচিসম্মত, যেমন, গল্প, উপন্যাস, মনোরঞ্জক ভ্রমণ-কাহিনী, আত্ম-চরিত ইত্যাদি। এই গ্রন্থমালার জন্যে বই নির্বাচন করার সময়ে বইগুলি যাতে বেশ ভালো ও লোকপ্রিয় হয় ও সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সমাজের রীতি-নীতি ভাবধারা, অনুভূতি আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে সে বিষয়ে সমান দৃষ্টি রাখা হয়।

আশা করা যায়, এই পরিকল্পনা, বিভিন্ন ভাষা-ভাষীর মধ্যে এক অন্যকে জানতে, বুঝতে ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে।

বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থগুলি বাছাই ক'রে অনুবাদ করা সহজ কাজ নয়। তাই উপদেষ্টা সমিতির সদস্যদের ও অনুবাদক গোষ্ঠীকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের নির্দেশ ও সহযোগিতা ছাড়া এ পরিকল্পনা কার্যে রূপায়ন করা সম্ভব হতো না।

বালকৃষ্ণ কেশকর

ভূমিকা

'পেক মেডলু' (তাসের প্রাসাদ), এখনকার সুবিখ্যাত তেলুগু উপন্যাস লেখিকা শ্রীমতী মুপ্পাল রঙ্গনায়কম্মার প্রসিদ্ধ রচনা। এতে নারী জাগরণের সহজ, সবল ও সজীব চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই উপন্যাসের নায়িকা ভানুমতী স্বাধীনচেতা নারী, অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বুঝতে পেরেও সে মানতে পারে না। পারিবারিক অশান্তিকে গোপন ক'রে মিথ্যে ভক্তি দেখানো ওর পক্ষে সম্ভব নয়। মিথ্যা পুরুষত্বের অহঙ্কারে মত্ত স্বামীর চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে অবলা হয়ে থাকা ওর পক্ষে শুধু অসহ্য নয়, অসম্ভব। যৌবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবজীবনে বিফল হতে দেখে ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। পরিশেষে নিজের সর্বস্ব—এমন কি নিজের শিশুসন্তান-টিকেও—ছেড়ে নিজের স্বামী, পরিবার ও এ সংসার থেকে চির-বিদায় নেয়। সামাজিক বন্ধনে ক্ষতবিক্ষত নারীর অসহায় বিক্ষুব্ধ হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে পুরুষের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করতে নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দেয়।

এই উপন্যাসের নায়িকা ভানুমতী চরিত্রে আধুনিক নারীর অসহায়তা ও বিফলতার সজীব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ নিজের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার ইচ্ছাকে বুঝতে যেসব পুরুষ অসমর্থ ভানুমতীর স্বামী রাজ শেখরম সেই পুরুষ জাতির প্রতীক। তার রঙিন কল্পনা থেকে বাস্তব বিবাহিত জীবন একেবারে আলাদা দেখে ভানুমতী ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তার ভাই কেশব রাও বোনের ইচ্ছাকে পদে পদে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। রাজ শেখরম ও কেশব রাও পুরুষজাতির দুই বিপরীতধর্মী স্বভাবের প্রতীক। রাজ শেখরমের নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করেও ভানুমতী শুধু নিজের ভাই-এর উপর নির্ভর করে বাঁচতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাই-এর স্নেহ ভালবাসা যতই গভীর হোক না কেন তা ভানুমতীর জীবনে একটা সম্বলই হতে পারে, তাকে 'নবজীবন' দিতে পারে না। তার ব্যর্থ জীবনকে সহ্য করতে না পেরে ভানুমতীর কোমল হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। ব্যর্থ প্রেমের

বোঝা নিয়ে নিঃশেষিত হ'য়ে গেল যে প্রাণ, সেই ভানুমতীর মৃত্যুতে জীবনে প্রথম আঘাত পেলো রাজ শেখরম। চোখ খুলল তার।

উপন্যাসটি সুগঠিত কাহিনীটিও সুবিন্যস্ত ও যদিও ভানুমতীর দুঃখপূর্ণ জীবন নিয়েই এই কাহিনী, আর বেশীর ভাগ ভানুমতীর কথাই শুনতে হয়, তবুও শেষ কি তা জানবার জন্য পাঠকদের মনে উৎসুক্য বরাবর-বজায় থাকে। ভানুমতীর ভাই কেশব রাও-এর সঙ্গে সঙ্গে পাঠকরাও বোধহয় ক্ষিধে-তেষ্টা ভুলে এ দুঃখের কাহিনী শুনতে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। অনাবশ্যক কথার বাহুল্য নেই। গল্পের শেষে ছেলের মাকে ফিরে পাবার ব্যাকুলতা পাঠকদের চিত্তেও করুণ রসের সঞ্চার করে।

গল্পের শেষে ভানুমতীর ভাই নিজেকেই প্রশ্ন করে, "তাহলে, ভানু তার জীবনে পরাজিত হল কেন? পদে পদে দুঃখই বা কেন পেল? ভানু যে সব মহান আদর্শকে তার জীবনে অনুসরণ করতে চেয়েছিল তা শুধু তাসের প্রাসাদ হয়ে রয়ে গেল কেন? এটা ওর দুর্ভোগ' বা কর্মফল বলেই কেন স্বীকার করতে হল?" এর উত্তরও পেয়েছে তার ভাই—"ভারতবর্ষে ভানু মেয়ে হয়ে জন্মেছিল যে।"

এই প্রশ্ন ও তার উত্তর এখন আমাদের ভারতীয় নারীর পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ। আজকালকার নারী অবোধ নয়, তার বুদ্ধির বিকাশ হয়েছে, পুরুষের মত সেও সব দিক দিয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে; পুরুষের অনুগামিনী অবলা আর সে নেই, সে পরের কথায় চলে না, নিজেও ভাবে। পুরুষের মত নারীর মনেও এখন আশা-আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম সব ক্ষেত্রেই সে পুরুষের সহচরী, অনুচরী নয়। **'পেক মেডলু'** পড়বার পর পাঠকদের মনে এ সব কথা জাগে এবং এখানেই এই উপন্যাসের সার্থকতা।

শ্রীমতী রঙ্গনায়কম্মার **'পেক মেডলু'** ছাড়া আরও কতকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এঁর প্রথম উপন্যাস **'কৃষ্ণবেণী'** ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়। প্রায় সেই সময় **'পেক মেডলু' 'আন্ধ্র প্রভা'**

নামের সাপ্তাহিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের হয়। পুস্তক-আকারে পরে ছাপা হয়।

এঁর প্রথম রচনা **'কৃষ্ণবেণী'**-তেই তাঁর প্রতিভার প্রথম স্বাক্ষর পাওয়া যায়। উপন্যাসের নায়িকা কৃষ্ণবেণী কুমারী অবস্থায় প্রেমের আগুন নিয়ে খেলবার চেষ্টা করে। প্রথমে যার সঙ্গে তার প্রেম হয় তার সঙ্গে বিয়ে না হয়ে, বিয়ে হয় অন্য লোকের সঙ্গে। ওর পূর্ব্বানুরাগের কাহিনী অবগত হলে ওর স্বামী ওকে ছেড়ে চলে যায়। এখান থেকেই গল্প, দুটি বিপরীত ধারায় গিয়ে শেষ হয়। প্রথম সংস্করণে লেখিকা স্বামী-স্ত্রীর পুনর্মিলন ঘটিয়ে গল্পটিকে শেষ করেন। কিন্তু পরে পাঠকদের অনুরোধে ও চাপে পড়ে স্বামীকে পরাঙ্মুখ ও নিষ্ঠুর ক'রে তুলে গল্পটির পরিণতি বিয়োগান্ত ক'রে তোলেন। লেখিকার ক্ষমতা ও শিল্প চাতুর্যের প্রমাণ এখানেই পাওয়া যায়।

এর পরের বেশীর ভাগ রচনা গুলিতে অসফল দাম্পত্য জীবনের চিত্র পাওয়া যায়। **'পেক মেডলু'**-তে ব্যর্থ দাম্পত্য প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখান হয়েছে। এঁর রচনাগুলির মধ্যে **'বলিপীঠম'** সব চেয়ে মার্জ্জিত, তবে **'পেক মেডলু'**-তে অক্ষরে অক্ষরে যেমন সজীব অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, **'বলিপীঠম'**-এ তা নেই। **'বলিপীঠম'** অসবর্ণ বিবাহের সমস্যা নিয়ে লেখা। অরুণা ও ভাস্কর আদর্শের স্রোতে ভেসে গিয়ে ক্রূর বাস্তবের ছবি কল্পনায়ও আনতে পারে নি। আদর্শ—নিঃসন্দেহে বড়ই মধুর, কিন্তু বাস্তবের স্পর্শে তার সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। ১৯৬৩ সালে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় আর ১৯৬৫ সালে এটি আন্ধ্রপ্রদেশ সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার লাভ করে।

'বলিপীঠম'-এর পরে শিল্প-কৌশল ও সজীব অভিব্যক্তির প্রমাণ **'রচয়িত্রী'**-তে পাওয়া যায়। **'রচয়িত্রী'** উপন্যাসে লেখিকার মনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। লেখিকা হিসাবে শ্রীমতী রঙ্গনায়-কম্মার যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। অনেকেই এই সুপ্রসিদ্ধ

লেখিকার সঙ্গে আলাপ করতে ও সাহিত্য চর্চা করার উদ্দেশ্যে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। লেখিকার স্বামীর এসব একটুও পছন্দ নয়। শেষে উনি বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু সেখানেও মনে শান্তি কই? অবশেষে পরিত্যক্তা পত্নীর সঙ্গে অনুতপ্ত স্বামীর মিলন ঘটে। এই উপন্যাসের দ্বারা লেখিকা স্ত্রী স্বাধীনতার সমর্থন করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য রচনার আদর্শ, লেখকের দায়িত্ব ও স্ত্রী পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ ইত্যাদি অনেক বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মত ব্যক্ত করেছেন। এটা লেখিকার অনুভূতিপূর্ণ রচনা।

আজকাল রঙ্গনায়কম্মার **'সুইট হোম'** (দু'খণ্ডে প্রকাশিত) প্রত্যেক বাড়ীতে বড় আগ্রহের সঙ্গে পঠিত হয়ে থাকে। পারিবারিক জীবনকে সুখী করা কতটা স্বামীর উপর নির্ভর করে এতে তা দেখাবার জন্য লেখিকা গোঁড়া সমাজের কতকগুলি নিরর্থক রীতি-নীতির সমালোচনা করেছেন। এই আমূল পরিবর্তনমূলক গল্পের প্রতিক্রিয়া রূপে শর্বরীর **'হট হোম'** সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

এঁর **'স্ত্রী'** নামের উপন্যাসটিও বেশ উৎকৃষ্ট রচনা। এতে প্রেমে ব্যর্থ নারীর তপোময় জীবনের বর্ণনা রয়েছে। স্ত্রীর প্রকৃতি চঞ্চল, একটা প্রচলিত ধারণা। কিন্তু **'স্ত্রী'**র স্ত্রী পুরুষের চেয়ে বেশী ধীর, সজাগ ও সংযত মনে হয়। এঁর আরেকটি উপন্যাস **'কুলিন গোডলু'** (ধ্বসে পড়া দেয়াল) পারিবারিক জীবনের উত্থান-পতনের সুন্দর নমুনা।

এই প্রধান উপন্যাসগুলি ছাড়া একটি গল্প সংগ্রহ **'শোভনং রাত্রি'** (প্রথম রাত) ছাপা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত লেখিকার দশ বারোটি উপন্যাস ও একটি গল্প সংগ্রহ ছাপা হয়েছে। মাত্র পনেরো বছর বয়েস থেকেই লিখতে শুরু করেছেন, আজ তাঁর বয়স ত্রিশ বছর। ভবিষ্যতে এঁর কাছ থেকে আরও ভালো ভালো লেখা পাবার সম্ভাবনা আছে।

অনুভূতির তীব্রতা, সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, নারীর গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত

করার প্রয়াস এঁর রচনাগুলিকে অকৃত্রিম সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। এঁর সব রচনাতে আনন্দময় জীবনের কামনা অকুণ্ঠিতভাবে মুখর হয়ে উঠেছে। সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চারুকলার এক একটি অঙ্গ এবং জীবনকে আনন্দময় করে তোলাও তাঁর মতে শিল্পকলার একটা বড় লক্ষ্য। সাহিত্যিক সাধনার চরম উদ্দেশ্য হল এই শিল্পকলার সাধনা।

শ্রীমতী রঙ্গনায়কম্মার মত লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উপন্যাসিক তেলুগুতে অনেক আছেন। এঁদের মধ্যে কোডবটিগণ্টী কুটুম্ব রাও, রাচ কোন্ড বিশ্বনাথ শাস্ত্রী, বলিবাত্ত কান্তা রাও, দ্বিবেদুল বিশালাক্ষী, যদ্দন পুড়ি সুলোচনা রাণী, কোডুরি কৌশল্যা দেবীর নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব লেখক-লেখিকা সম্প্রতি উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য সক্রিয় সহযোগিতা করছেন। তেলুগুভাষী পাঠকদের কাহিনী ও উপন্যাস পড়ায় বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। পাঠকদের রুচিকে মূল্য দিতে সমর্থ এমন লেখকেরও আজকাল অভাব নেই।

যদিও ১৮৭৮ সালে কন্দুকুরি বীরেশলিঙ্গমের 'রাজ শেখর চরিতম' দিয়ে তেলুগু উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল তবুও সম্প্রতি উপন্যাস রচনার পূর্ণ বিকাশ হয়েছে। বীরেশলিঙ্গমের পরে লক্ষ্মী নারায়ণের 'মালপল্লী'-উপন্যাসও সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সামাজিক জীবনের চিত্র অঙ্কিত ক'রে সমাজকে সব দিক দিয়ে পালটাবার ব্যাপারে উপন্যাসের যে বিশেষ ক্ষমতা আছে, লেখকরা নতুন করে তা উপলব্ধি করছেন। তেলুগুতে উপন্যাসকে 'নওলা' কিংবা 'নওলিকা' বলা হয়। এ শব্দটি মূল ইংরাজি শব্দ থেকে এলেও ভারতীয় সাহিত্যের আধুনিক গতিবিধি লক্ষ্য করলে এই শব্দ গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

কবি সম্রাট বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের 'বেয়িপডগলু' আর বাপিরাজুর 'নারায়ণ রাও' প্রায় একই সময় প্রকাশিত হয়েছে। দু'জনেই রচনাশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সত্যনারায়ণের 'একবীরা'র চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। দ্বিবেদুল বিশালাক্ষীর 'বারধি' উপন্যাসেরও চিত্ররূপায়ণ হয়েছে।

সম্প্রতি তেলুগু পত্র পত্রিকায় কতকগুলি ধারাবাহিক উপন্যাস

বেরুচ্ছে। পাঠকদের আগ্রহে ও লেখকদের উৎসাহে এই উপন্যাসগুলির প্রচার দিন দিন বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি এ ব্যাপারে কবি সম্রাটেরও বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। প্রতিবছর কাহিনী, উপন্যাস, প্রবন্ধের প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হচ্ছে। এই সব কারণে উপন্যাসিকরা যথেষ্ট উৎসাহ পাচ্ছেন। তেলুগু উপন্যাসের ক্ষেত্রে আজকাল একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা উল্লেখযোগ্য। অন্য ভারতীয় ভাষায়, অন্ততঃ হিন্দীতে এটা ততটা দেখা যায় না। এই বিশেষত্ব হল, পুরুষ লেখকের তুলনায় মহিলা লেখিকাদের সংখ্যা বেশী। এক দিক দিয়ে এটা ভাল লক্ষণ। সামাজিক বাস্তব জীবনের জটিলতা বুঝতে মহিলারা যত সমর্থ, সাধারণতঃ পুরুষরা তত নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোমল ভাবের সুমধুর অভিব্যক্ত ফুটিয়ে তোলা সহজ ও এ গুণ তাদের নিজস্ব। কাব্যের পরমার্থ যদি 'কান্তসম্মত' হয় তো এ কান্তাদের দ্বারাই সুচারুরূপে কাব্যচর্চা সম্ভব হতে পারে। সেকালে নাটকে নারীর ভূমিকায় পুরুষই অভিনয় করতো কিন্তু এখন আর তা হয় না। পুরুষ পুরুষের ভূমিকা ও নারী তার নিজের ভূমিকায় অভিনয় করছে। আজ তেলুগু উপন্যাসের রচনাতেও এটা দেখা যাচ্ছে। মহিলাদের লেখা উপন্যাসে নারী সমাজের সমস্যা অনেক বেশী সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হচ্ছে। পুরুষদের লেখা উপন্যাসগুলো জীবনের ব্যাপক ক্ষেত্রের সঙ্গে মিশে আছে। এই দু'টি ক্ষেত্র আলাদা হয়ে যাচ্ছে। এই দুই ধারা ছাড়াও, বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণের মত প্রসিদ্ধ লেখকের অসাধারণ রচনাগুলি তৃতীয় একটি ধারার সৃষ্টি করছে। যাই হোক্ এখন তেলুগু উপন্যাসে মহিলাদের সংখ্যাই বাড়ছে।

শ্রীমতী মুপ্পাল রঙ্গনায়কম্মার এখনকার উপন্যাস লেখিকাদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছেন। এঁর **'পেক মেডলু'কে** (তাসের-প্রাসাদ) ভারতের বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে মেলে ধরতে পেরে আমার আনন্দের সীমা নেই। আশা করি সুধীজন একে আনন্দে স্বাগত জানাবেন।

পাণ্ডুরঙ্গ রাও

ভানুর অট্টহাসিতে আমি চমকে উঠলাম। উঠে বসতেই মনে হলো কোনও অজানা ভয় আমায় চেপে ধরেছে। কি জানি, ভানু বোধহয় কাঁদছে। মাঝরাত, আর ও একা। অন্ধকারে খাটে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম। একবার ইচ্ছে হলো গিয়ে দেখি। আবার মনে হলো মাঝরাতে ওর ওখানে গেলে না জানি ও আবার কি ভাববে, হয় তো বা কিছু বলেই বসবে। এই দ্বিধা নিয়ে আমি আবার ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। একটু তন্দ্রা আসতে না আসতেই কে যেন আমায় জাগিয়ে দিল। চোখ খুলতেই সামনে দেখি রাজ শেখরম, ভানুর স্বামী। ওর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। ব্যাকুল কণ্ঠে বলছিল, "ভানু...নেই...এই চিঠিগুলো..." আমি ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হ:লা কোন দুঃস্বপ্ন দেখছি। ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করলাম, "ভানু বাড়ীতে নেই? কোথায় গেছে? কি হয়েছে?"

অপরাধীর মত মাথা নীচু ক'রে সসঙ্কোচে বলল, "জানি না, আমিও জানিনা। বিট্টুর কান্নার শব্দে জেগে যাই। ওর মা ওকে চুপ করাবে ভেবে আবার শুয়ে পড়লাম। রান্নাঘরের দিক থেকে আবার কান্নার শব্দ আসাতে আমি ওদিকেই চলে যাই। অনেকক্ষণ ধরে ডাকাডাকির পরও কোনও সাড়া না পাওয়াতে সন্দেহ হল। তক্ষুণি ঘরে ফিরতেই দেখি মেঝেতে এই চিঠিগুলো পড়ে আছে। সব চেয়ে উপরের চিঠিটা আমার নামে। চিঠি খুলেই অবাক—চিরদিনের জন্য তোমাকে ছেড়ে তোমার জীবন থেকে আমি সরে যাচ্ছি, ইত্যাদি অনেক কথা লেখা ছিল। আমি সব পড়তেও পারিনি। বিট্টুকে পাশের বাড়ী রেখে আমি এখানে চলে এলাম। আপনি..."এ পর্যন্ত বলে ও চুপ হয়ে গেল।

আমি সব বুঝে নিলাম। রাত্তিরে নিশ্চয় কিছু হয়েছে। ভানু সব বন্ধন ছিঁড়ে, এমন কি ছোট্ট ছেলেটির মায়া কাটিয়ে, চিরদিনের জন্য চলে গেছে। একেবারে হতাশ হয়ে বোধহয় মৃত্যুর খোঁজে গেছে···। পাগলের মত চীৎকার করে উঠলাম, "ভানু!" দুঃখ সইতে না পেরে দেয়ালে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলে উঠলাম, "হায়, আমার

ভানু!” হঠাৎ আমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান ফিরে এল। আলনা থেকে সার্ট নিয়ে গায়ে দিলাম আর ভানুর চিঠিগুলো সব পকেটে রেখে নিলাম। চিঠি পড়বার সময় এটা নয়। পাশের ঘরে গিয়ে আমার বন্ধু দু'জনকে জাগিয়ে দিয়ে সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলাম। তক্ষুণি আমরা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম—কেউ সমুদ্রের দিকে, কেউ রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে। তখন রাত তিনটে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আপ্রাণ চেষ্টা করেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। সারা সমুদ্রতট তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল। ভিজে বালিতে পাগুলো জমে যাচ্ছে। তাই কোনও রকমে টেনে হিঁচড়ে হাঁটতে হাঁটতে, টর্চের আলো ফেলে ঢেউয়ের উপর নজর রেখে কখনো এগিয়ে গেলাম, কখনো পেছনের দিকে ছুটলাম। কখনও-বা থেমে ভানু! ...বোন...ভানু! বলে চিৎকার করতে লাগলাম। এভাবে তিন ঘণ্টা ধরে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে কখন যেন ভোর হয়ে গেল। ভানু পালিয়েছে, অনন্ত সাগরের মাঝে, চির নবীন ধারায় বিলীন হয়ে গেছে, চিরদিনের জন্য ভানু চলে গেছে। 'বোন' বলতে বলতে আমি হতাশ হয়ে বসে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। “ভানু চলে গেছে, ও আর নেই, নেই... ।”

কিন্তু পরক্ষণেই অন্তরের সব বেদনা ও হাহাকারের পরিবর্তে রাজ শেখরমের প্রতি আক্রোশ, ঘৃণা ও প্রতিশোধের ভাব আমার অন্তর ছেয়ে গেল; আঙ্গুলগুলি মুষ্টিবদ্ধ হলো। ক্রোধে দাঁত কড়মড়িয়ে উঠল, গরম গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। ওখান থেকে আমি চলে এলাম।

সামনে দেখলাম, সারা রেল লাইন খোঁজার পর ওরা তিনজন ফিরছে। রাজ শেখরম আমাকে দেখেই বলে উঠলো, “ষ্টেশন থেকে খবর নিয়েছে, রাত্তিরে রেলওয়ে লাইনে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে নি তো।”

“খুব কাজ করেছ তুমি। যা কিছু হয়েছে তোমার ওখানেই হয়েছে। সত্যি ক'রে বলতো, রাত্তিরে কি হয়েছিল?”

শুনে ও বিবর্ণ হয়ে গেল। আমি রেগে অপমান ক'রে কথা বলেছি বলেই বোধ হয়। আমি আর কিছু বলতে যাবার আগেই ও বলে উঠলো, "রাত্তিরে তো কিছু হয় নি।"

"কিচ্ছু হয়নি? কিচ্ছু না?"

"কিচ্ছুই হয় নি দাদা!"

"সত্যি? কিছুই হয়নি তো নিজের এত আদরের ধন বিট্টুকে ও ছেড়ে চলে গেল কেন? চোর, বদমাশ কোথাকার! তোমার পাপের ঘড়া এবার পূর্ণ হয়েছে। আমার বোনকে সারা জীবন তুমি কষ্ট দিয়েছ, এখন প্রাণ নিতেও কসুর করো নি। নিরীহ এক প্রাণীকে তুমি নৃশংস ভাবে হত্যা করেছো, কি পাপী তুমি..." বলতে বলতে ওকে দু'থাপ্পড় লাগালাম। তারপর ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওকে সমানে মেরেই চললাম। লাথি মেরে, ধাক্কা দিয়ে ওকে ধরাশায়ী করলাম, তবুও আমার রাগ মিটল না, মার ধোর চলতে লাগলো। শেষে বন্ধুদের ধরাধরির পর ওকে ছেড়ে দিতে হল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না। আমার সে যে কি অবস্থা বলে বোঝানো যায় না। ভানু চলে গেছে, নিজের ছেলেকে ছেড়ে চলে গেছে। এখন তার সব দায়িত্ব আমার—শুধু আমার।

আমার কোলে বিট্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। আহা, কি অবোধ চেহারা ওর—আমার চোখের জল টপটপ করে ওর গালে ঝরে পড়ছে আর অশ্রুসিক্ত কপোল মুছিয়েই চলেছি। তীরের বেগে রেলগাড়ী ছুটে চলেছে, আর আমার মন চলে গেছে অতীতে।

স্কুল ফাইনালের ফল দেখে ভারী খুশি হলাম। ভাবলাম তক্ষুণি ভানুর ওখানে গিয়ে দু'জনে মিলে আমোদ-আহ্লাদ করি, আর ওর আনন্দে ভাগ বসাই। কিন্তু বাবার অনুমতি পেতে দু'দিন কেটে গেল।

ষ্টেশন থেকে কাকাবাবুর ওখানে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। বাড়ীর দরজায় পা দিতে না দিতেই কাকাবাবু, কাকীমা, বোনেরা সবাই আমায় অভ্যর্থনা ক'রে, বাড়ীর সকলে কে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা দু'জনেই পাস করেছি জেনে সবাই অভিনন্দন জানালেন। গাঁয়ের সব খবর জানতে চাইলেন। বাড়ীতে যেন আনন্দের জোয়ার এলো। কেশব এসেছে, কেশব দাদা এসেছে বলে সবাই আমায় ঘিরে ফেলল। ছোটদের সবাইকে মিষ্টি, বাঁশী, বেলুন দিলাম। ছোটরা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বাঁশী বাজাতে লাগলো। বাড়ীতে যেন মেলা বসেছে। ভানু বিরক্ত হয়ে ওখান থেকে উঠে গেল। আমার ধারণা ছিল একবারেই পাস ক'রে কতই না খুশি হবে ভানু, কিন্তু খুশি হওয়া তো দূরের কথা, ওকে যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত দেখলাম। সাধারণতঃ ও ছোটদের সঙ্গে বেশ মিলে মিশে থাকতে ভালবাসে আর দুষ্টুমীতেও কম যায় না। ওকে এরকম বিষণ্ণ আমি আগে কখনও দেখি নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কিরে ভানু, এত বিষণ্ণ কেন ?"

রুক্ষস্বরে ও জবাব দিলে, "কই, না তো।"

এরই মধ্যে ছোটদের দুষ্টুমিতে জ্বালাতন হয়ে ও ওখান থেকে উঠে গেল। ব্যাপারটি কি, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। কাকীমা রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। ওঁর পেছনে পেছনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কাকীমা, ভানুকে এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন ?"

রান্না ঘরের কাজ করতে করতে কাকীমা আমায় পিঁড়েতে বসতে বললেন। চাল ঝাড়বার জন্য উনিও হাতে কুলো নিয়ে আমার কাছে বসে পড়লেন। "পড়াশুনা ক'রে কি হবে বাবা যখন নিজের অবস্থা বোঝবারই শক্তি নেই ? ও কলেজে পড়তে চাইছে। আমরা বারণ করেছি। তাই সকাল থেকে না খেয়ে দেয়ে জেদ ধরেছে। দেখো কেশব···

কাকীমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললাম, "ভানু তাহলে কলেজে পড়বে না ?"

"তুমিও বাবা খুব বলেছো ! ষষ্ঠীর কৃপায় সন্তান অনেক, ওর মধ্যেও মেয়েই বেশী। কখনও বিয়ে, কখনও জন্মদিন, আর ব্রত লেগেই আছে। আজ কারুর ছেলেপিলে হচ্ছে, কাল কারুর বিয়ে। খরচের অন্ত নেই। তুমিই বল বাবা। আয় তো বেশী নয়। এ গাঁয়ে স্কুলটি ছিল বলেই এতদিন পড়াশুনা করতে পেরেছে। কোন অসুবিধে হয়নি। মেয়েকে বাইরে পড়াতে পাঠাবার সামর্থ্য আমাদের নেই। ও এ সবই তো জানে। তবে আর আমি কাকে কি বোঝাবো ?" কাকীমার কথাতে আমি তো থ। উনি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। আমিও নিঃশব্দেই বসে রইলাম।

"মা সরস্বতীর কৃপা ওর উপর আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওকে পড়াবার ক্ষমতা তো আমাদের চাই। ওর সব আশাই পূর্ণ হবে এতো ভাগ্যবতীই যদি হ'ত তো আমার কোলেই বা কেন এলো ?" বলতে বলতে কাকীমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। ওঁকে আঁচলে চোখ মুছতে দেখে আমার খুব কষ্ট হলো। আমি সেই প্রথম বুঝলাম গরীব হওয়ার কি দুঃখ !

কথাটা ঠিক। কাকাবাবুর আয় কম, বিস্তর ছেলে পিলে। খরচ পত্রও প্রচুর। মেয়েকে কলেজে পড়াবার ক্ষমতা ওঁর নেই। কাকীমা মেয়েকে খুবই ভালবাসেন। মেয়ে যে বুদ্ধিমতী তাও তিনি ভালো করেই জানেন। কিন্তু ওঁর কিই-বা করবার আছে ! উনি নিরুপায়। তবু ভানুর এত বড় আশাকে এভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিলে ওর কি দশা হবে ? এ অবস্থাকে কি ও মানিয়ে নিতে পারবে ?

ভানু···ভানুমতী...আমার ঠাকুমার বড় বোনের পৌত্রী। এই গেল বছর পর্যন্তও আমাদের মধ্যে এ সম্পর্ক ছাড়া আর কোনই সম্বন্ধ ছিলনা। আমি স্কুল ফাইনালে ফেল ক'রে পিসিমার গাঁয়ে আর পড়তে যাই নি। বাবা আমাকে এখানে হাইস্কুলে ভর্ত্তি ক'রে

কাকাবাবুর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। ভান্নু দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় পাস ক'রে স্কুল ফাইনালে উঠেছিল। আমরা তু'জনে এক ক্লাশেই পড়তাম তাই খুব ভালো লাগত। বাড়ীর সকলের চেয়ে ভান্নুর সঙ্গেই আমার বেশী ভাব হয়েছিল। যেদিন আমি এসেছিলাম সেদিন লজ্জায় বাইরের ঘরেই বসেছিলাম। ভান্নু আমার কাছে এসে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কথা বলেছিল। "দাদা, মা তোমাকে খেতে ডাকছে।" ওর দাদা ডাক আমার খুব ভাল লাগলো। আমার নিজের বোনও আমাকে 'দাদা' বলে এমন ক'রে কখনও ডাকে নি। ছোটবেলা থেকেই ও আমাকে আমার মায়ের দেখাদেখি 'কেশী' বলেই ডাকত। ছোটবেলায় কেউ ওকে শেখায়ও নি বড় ভাই এর নাম ধরে ডাকতে নেই। বড় হবার পর আমি কয়েক বার বারণ করেছিলাম কিন্তু ও আমার কথা কানেই দিত না। বলতো, "আমি নিজের ইচ্ছেমত ডাকব, তুমি আমাকে শেখাবার কে ? উত্তর দিতে না চাও 'তো দিওনা, আমার বয়ে গেল।"

ভান্নু আমাকে আদর ক'রে 'দাদা' বলে ডেকেছে। লক্ষ্মী বোনটি আমার। আমি ওর দিকে চেয়ে রইলাম। ঈষৎ হেসে ভান্নু বললে, "কি, ক্ষিধে পায়নি ?" আমি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। সেদিন থেকেই ভান্নু আমার মনের অনেকখানি জুড়ে বসল, আর বোনেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হ'ল। বয়সে ভান্নু আমার চেয়ে তু'বছরের ছোট—ফর্সা রং, ছিপছিপে স্নুন্দর চেহারা। রূপের চেয়ে ওর গুণ ছিল বেশী। আমি ক্লাশে দ্বিতীয়বার পড়ছিলাম, তবুও অঙ্ক-টঙ্ক কয়েকটি জিনিস ওর কাছেই শিখতাম। যখন ভান্নু আমাকে কিছু বোঝাতো আমার খুব অহংঙ্কার হ'ত। ভান্নু অঙ্ক ও বিজ্ঞানে বরাবর প্রথম হত। আমরা তু'জনে মিলে স্কুলে যেতাম। সিনেমা দেখা, উপন্যাস পড়া, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া, সব সময়ে তু'জনে। প্রত্যেক জায়গায় একসঙ্গে যেতাম। সিনেমা দেখা বা গল্প পড়ার পর আমরা প্রায়ই সেসব নিয়ে আলোচনা করতাম। ভান্নুর খুব তীক্ষ্ম বুদ্ধি ছিল। ওর মা যদি কখনও

কোনও অনুচিত কথা বলতেন তো ও সহ্য করত না। মা একটু কটু কথা বললে দ্বিগুণ কটু ভাষায় জবাব দেওয়া ওর অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। ওকে যখন আমি বলতাম, মা কিছু বললে মুখে মুখে জবাব দেওয়া ঠিক নয়, তখন ও বলতো, "কেন, বিনা কারণে আমায় বকলে আমার বুঝি দুঃখ হয় না ?" ও বলত, "মানুষের ব্যক্তিত্বই সব চেয়ে বড়।" ওর অকাট্য যুক্তি।

ভানু এটা তোমার আবেগের কথা। তুমি কি মনে কর ব্যক্তিত্ব বাড়াবার জন্য সবাই অনুকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা পায় ?"

"যাই বল দাদা, আত্মসম্মান হীন কদর্য জীবনকে তুমি কি জীবন বল ?

ঠিক কথা। যখন আমাদের অস্তিত্বের কোন মূল্যই নেই তো বাঁচা ও না বাঁচার মধ্যে কি তফাৎ ? কিন্তু এমন অভাগা তো অনেকেই আছে যারা এরকম পরিবেশে জীবন ধারণ করছে। এর কি উদ্দেশ্য ? একথা না জানি আমি, না জানে ভানু।

ভানুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা একটু অদ্ভুত রকমের। ওর সঙ্গে থেকে থেকে আমি বড় বেশী ভাবুক হয়ে উঠেছিলাম। পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসছিল, পরীক্ষার পর আমরা কি কি করবো। সেটা ঠিক করাই আমাদের প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। "আচ্ছা, বলতো কোন কলেজ ভালো হবে ? আমরা দু'জনে একই গ্রুপ নেব নিশ্চয়। আমরা যা কিছু পড়ব একসঙ্গে পড়ব। তুমি ডাক্তার হতে চাও, না উকীল ? ডাক্তার হওয়ার মত সম্মান আর কিসে আছে ? ডাক্তার কেশব রাও, ডাক্তার 'ভানুমতী দেবী।" সে সময় আমরা হেসে হেসে কত জল্পনা-কল্পনাই করতাম। আজ যে এই হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি।

ভানু আর পড়তে পারবে না ভাবতেই আমার চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এবার ভানু আমার থেকে দূরে সরে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে ওর ভালবাসাও। এ কথা কেমন ক'রে ওকে খুলে বলব ? তবুও ভানু যাতে এ সময় ধৈর্য্য ধরতে পারে তার চেষ্টা করা আমারই

কাজ। ওকে সান্ত্বনা দিতেই হবে। কাকীমা কোনও কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, আমিও বেড়িয়ে এলাম।

ম্লান মুখে ভানু ঘরে বসেছিল। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সাহস সঞ্চয় ক'রে যেই কিছু বলতে যাচ্ছি এমন সময় ও আমার হাত ধরে নিল। আমার দিকে চেয়ে বললে—"এবার আমরা আলাদা হয়ে যাব দাদা, তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো ?"

—"ভানু !" বলতে বলতে আমার মনটা ব্যথায় টন টন ক'রে উঠলো।

—"দাদা, তুমি ভাগ্যবান। এখন তুমি কত পরীক্ষায় পাশ করবে, কত উন্নতি করবে, না ?"

আমি টেবিলে ভর দিয়ে ভানুর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলাম। —"আমরা কত ভেবেছিলাম যে দু'জনে এক সঙ্গেই পড়ব। কিন্তু তোমার পড়া হবেনা আর আমি একলা···না না, আমিও যদি পড়াশোনা ছেড়ে দি তবে হয়তো ঠিক হয়। বুদ্ধিমতী ভানুই যখন কলেজে পড়তে পাবে না আমার পড়ে কি লাভ ?"

ভানু মৃদু হেসে বলল, "আমাকে তুমি কত ভালবাস দাদা। তুমি বড় হলে আমিও তো খুশি হব। আমার জন্য তুমি পড়াশোনা ছাড়তে যাবে কেন ? নিশ্চিন্ত মনে উৎসাহ নিয়ে তুমি পড়ে যাও। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমাকে স্মরণ করো।" ভানু যখন করুণ স্বরে এসব বলছিল আমি আর থাকতে পারলাম না, অন্যমনস্ক হয়ে নিজের ভাবনা-চিন্তায় ডুবে গেলাম।

ভানুর আশা পূর্ণ করার ক্ষমতা কাকাবাবুর নেই। কিন্তু আমার বাবা অনায়াসে ভানুর মত দশটি মেয়েকে পড়াতে পারেন। কাকাবাবু সে প্রাচুর্য্যের কল্পনাও করতে পারেন না। ওঁর ছেলে হওয়ার দরুণ আমি ঠাকুরদার সম্পত্তিও পাব। কিন্তু আমি কি-ই বা করতে পারি ? কিছুই করতে পারব না, বাবাকে কিছু বলতে পারব না বললেও উনি রাজী হবেন না। মেয়েদের পড়াশোনার উনি বিরুদ্ধে। আমার নিজের বোনকে এই জন্য পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত

পড়িয়েই বিয়ে দিয়ে দেন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি ছোট্ট প্রাণ কত কাতর হয়ে উঠেছিল তা উনি ধরতেও পারেন নি। যাক্‌গে এ বোনের জন্যও আমি কিছু করতে পারব না। ভানুর মত প্রতিভাশালিণী মেয়ে যদি কালের সমুদ্রের অতল তলে এমন ক'রে তলিয়ে যায় তাতে দেশের কি কোনও ক্ষতি হবে না? কিন্তু নিজের ক্ষতি দেখেও দেশ যখন স্থির হয়ে বসে আছে আমিই বা কি করতে পারি? বৃথা ভেবে শুধু দুঃখই পাব।

—"কি ভাবছ দাদা?"

—"সম্পত্তি দেখাশোনার ভার যদি আমার উপর থাকত ভানু তো কোনও ভাবনাই ছিল না। কিন্তু বাবাকে তো তুমি জানই··· ওঁকে কিছু বলা নিরর্থক।"

—ভানু আশ্চর্য্য হয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। "আমি কখনো ভাবতেও পারি নি যে, আমার এমনও একজন দাদা আছে যে আমাকে এতবেশী ভালবাসে। দাদা, তোমার এ স্নেহ যেন অক্ষুণ্ণ থাকে, শুধু এই আমার কামনা। এর বেশী আমি আর কিছু চাই না।" ভানুর চোখ দু'টি জলে ভ'রে গেল।

ভানুর হাত ধরে আমি বললাম, "তুমি বিশ্বাস কর ভানু, আমার মনের মধ্যে তোমার যে স্থান তা শারদারও বোধ হয় নেই। শারদার সঙ্গে আমার জন্মের সম্বন্ধ, তা অবশ্য অবহেলা করতে পারি না। কিন্তু তোমার আমার মধ্যে যে স্নেহ তা অন্তরের বন্ধন। এই জগতে এর মত সম্পর্ক আর নেই। তুমি সব সময় মনে রেখ, তোমার শুভাকাঙ্খী প্রিয় ভাই তোমার জন্য সব সময় সব কিছু করতে প্রস্তুত। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। কোনও জিনিষের দরকার হলে আমায় লিখ।···দেখ ভানু, আজ সারাদিন তুমি না খেয়ে আছো এরজন্য তোমার মা কত দুঃখ পাচ্ছেন, কখনও কি তা ভেবেছ? আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে মেনে নিতেই হবে ভানু! তুমি তো সবই জান। "ভানুকে যখন এমন ক'রে বোঝাচ্ছিলাম তখন সারাক্ষণ একটা কথা ভেবে আমার মনে খুব কষ্ট

পাচ্ছিলাম যে ওর জন্য আমি কিছুই করতে পারছি না। কাল আমি লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি পাব, তার মূল্য অ মার কাছে কানাকড়িও নয়। যে অর্থ আমার নিতান্ত দরকারেই পেল।ম না তা নিয়ে পরে আমি কি করব ?

সেদিন রাতে ভানু নিজেই আমাদের দু'জনের ভাত বেড়ে আনল। ভানু খুব ভাবপ্রবণ কিন্তু বিচার করার ক্ষমতাও ওর কম নয়। ওকে মাথা নিচু করে খেতে দেখে আমার কান্না পেযে গেল ।

ভানুর ম্লান মুখ দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। কল্পনার জালে বোনা স্বপ্ন-সৌধ রচনায রত ভানু এ নৈরাশ্য কেমন ক'রে সহ্য করবে ? ওর কোমল হৃদযে কি এত শক্তি আছে যে সকল আশা ও স্বপ্ন বিফল হতে দেখলে তার আঘাত ও সইতে পারবে ?

আমি কোন কলেজে ভর্ত্তি হব, কি কি বিষয নেব, কোথায থাকব সব বিষয় ভানুর পবামর্শ নিলাম। কলেজে যাবার পরই, প্রোফেসররা কেমন লেকচার দেন, কলেজের মেযেরা কেমন, ছেলেরা কি ভাবে মেযেদের বিব্রত ক'রে, সব কিছু বিস্তারিতভাবে ভানুকে লিখেছিলাম। যা কিছু দেখতাম, শুনতাম ভানুকে না লিখলে মন সরতো না। উপন্যাস পড়তে ভানু ভালবাসত। যে কোনও বিখ্যাত উপন্যাস পেলে ভানুকে পাঠিযে দিতাম। পড়বার বই থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে চিঠি লিখলে আমার মনে হ'ত যেন আমরা একসঙ্গেই পড়ছি। ভানুর মনের এই ব্যথা কি ক'রে ঘোচে ও তার মন কি ক'রে প্রফুল্ল থাকে এই আমার প্রধান চিন্তা ছিল। ভানু যেন কৃতজ্ঞতার ভারে উচ্ছল হয়ে উঠত আর এত খুশি হয়ে উত্তর দিত যে, আমি চোখের জল সামলাতে পারতাম না। ভানু আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়ে যদি গ্রাজুয়েট হয়ে যেতো তাহলেও বোধহয আমার এত বেশী আনন্দ হত না।

ক্রমে ক্রমে ভানুর চিঠিতে বিষাদের ভাব কমতে লাগল। ও এখন হিন্দী পড়তে আরম্ভ করেছে। পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী

হচ্ছে, লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে আগের মত পড়াশোনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এসব জেনে আমার মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা ভালো ভাবে পাস করলাম। তার আনন্দের সঙ্গে আর একটা আনন্দের খবর পেলাম। ভান্নুর বিয়ের চিঠি ও সঙ্গে তার নিজের লেখা চিঠি। আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম, ভান্নুর বিয়ে হঠাৎ এত শীগ্‌গির কি ক'রে হচ্ছে। বর বি· এ· পাস রাজ শেখরম। খবর তো ভালোই কিন্তু তবুও আমার মনে হল, কোথাও যেন কিছু গলদ রয়ে গেল। ভান্নু ডাক্তার হতে চাইছিল, ওর সে আশা পূর্ণ হলো না। আর কিছু না হোক্ ও অন্ততঃ ডাক্তারের স্ত্রী তো হতে পারত। কিন্তু আমি বৃথাই ভাবছিলাম। ডাক্তার পাত্রের জন্য অনেক টাকার দরকার। আজকালকার দেনা পাওনার ব্যাপার খুব ভাল করেই জানি। কাকাবাবু ডাক্তার জামাই করতে পারতেন তো ভান্নুর পড়াশোনাই বা কেন বন্ধ করলেন? বি· এ· পাস জামাই জোগাড় করতেই না জানি কত টাকা লেগেছে। বিয়ের চারদিন বাকী ছিল। কলেজ খোলার আগে জামা কাপড় তৈরী করার জন্য বাবা আমায় দু'দিন আগেই তিনশো টাকা পাঠিয়েছিলেন। সেই টাকা নিয়ে সোজা বাজারে গিয়ে ভান্নুর জন্য একটা দামী ঘড়ি ও ভাবী ভগ্নীপতির জন্য একটী কলম কিনলাম।

ভান্নুর হাতে ঘড়ি পরাবার সময় দেখলাম ওর উজ্জ্বল চোখ আনন্দে আরও জ্বল জ্বল ক'রে উঠল, ওকে কত ভালবাসি তার গর্ব্বে ওর গদগদ চেহারা···। এই আনন্দটুকু পাবার জন্য আমি ভান্নুর জন্য কি না করতে পারি।

—"দাদা, এ উপহার অমূল্য। কিন্তু আমি তোমায় কিবা দিতে পারি?"

—"পরে আমি চেয়ে নেবো, কেমন?"

বরের বিষয় সবিস্তারে জানবার জন্য আমি উৎসুক ছিলাম। ভানুর ভাবী স্বামী নিশ্চয়ই অসাধারণ একটা কিছু হবেন।

—"আচ্ছা ভানু, বিয়ের ঠিক হবার আগে তুমি নিশ্চয় ওঁকে দেখেছ। কি রকম? কিছু তো বল? স্বর্ণবরণ, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, সুন্দর চেহারা, উন্নত বক্ষ...আর...?"

—"চার চারটে হাত, হাতে রত্ন আভরণ, পায়ে পাদুকা..."

—"তাই নাকি? আমি ভেবেছিলাম উনিও আমাদের মতই মানুষ।"

—"আঃ, তোমার সবটাতেই ঠাট্টা।"

—"না, ঠাট্টা নয়। আসল কথা ভানু, তুমি কোনও খবর না দিয়েই নিজের বর পছন্দ করলে, তার জন্য আমার কাছে তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল। সে তো করোনি। অন্ততঃ আমি জিজ্ঞাসা করার পর তো ওঁর বিষয় বলতে পারতে...আমার মোটেই ভাল লাগছে না", বলে অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে বসলাম।

ভানু মৃদু হেসে আমার থুতনি নেড়ে বলল, —"অমন মুখ ঘুরিয়ে বসোনা দাদা, তবে কিছুই শুনতে পাবেনা।"

—"ও! তারমানে উনি মুখ দিয়ে শুনেন আর কান দিয়ে বলেন। সেই জন্যই তো তোমার পছন্দ।"

—"হ্যাঁ মশাই। কিন্তু একথা আমার দাদা কি করে জানল?" বলে ভানু ওর ঘড়ি পড়া হাতটা থুতনির তলায় রেখে চিন্তিত ভাবে বলল। আর অভিমান দেখিয়ে লাভ নেই। থুতনি থেকে ওর হাতটা টেনে নিয়ে বল্লাম, "তোমার পছন্দ হয়েছে তো?"

ও মৃদু হেসে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, "পছন্দ, অপছন্দের আর কি? মা, বাবা ওঁকে দেখে ভানুর উপযুক্ত মনে করেছেন। আমিও দেখেই পছন্দ করেছি। হঠাৎ সব ঠিকঠাকও হয়ে গেল। আপন বলতে ওঁর কেউ নেই, সব দূর সম্পর্কের। ওঁরাই ওঁর সম্পত্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাই দিয়ে ওঁকে পড়িয়ে মানুষ করেছেন। বি.এ. ডিগ্রী নিতেই সব সম্পত্তি শেষ। এখন

শুধু চাকরীর উপরই নির্ভর। এইজন্য মার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মানুষের দাম গুণে। সম্পত্তি কতদিন থাকবে? তার উপর কতটুকু আশা করা যায়?"

—"সত্যি ভানু! তুমি ভালোই করেছ। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই সেও বরঞ্চ ভালো। আরামে দিন কাটাতে পারবে। তবে হয়তো আমায়ও ভুলে যাবে?"

নিশ্চয়ই ভুলে যাবো, শহুরে জীবনে ভেসে যাবো। 'বীচে' বেড়াতে যাব, সিনেমা দেখব, পিকনিক করব, পার্টি দেবো—কি মজা।"

"বেড়াও, খুব বেড়িয়ে বেড়াও, ওখানে কেউ হিংসে করার নেই। কিন্তু ওঁর রূপের বিষয় তো কিছু বললে না। কামদেব, না মহারাজা নল?"

"রাজপুত্তুর!"

"চমৎকার! এত সুন্দর?"

"হ্যাঁ, যেমন তেমন নয়, অপার্থিব সৌন্দর্য।" আমরা দু'জনেই হেসে উঠলাম। এর মধ্যে কাকীমা এসে পড়লেন। আমি ওঁর কাছে নালিশ করলাম, "দেখনা কাকীমা, ওর বরের বিষয় কতবার জিজ্ঞাসা করছি, ও কিছুই বলছে না।"

"পাগলা কোথাকার! ও কি বলবে? রূপ তো আছে কিন্তু পয়সায় ঢুঁ ঢুঁ। সুখ-দুঃখের সঙ্গীও কেউ নেই। এর জন্যই আমার ভাবনা।"

"চিন্তা করার কি আছে? ভানু তো খুশির চোটে লাফাচ্ছে। বেড়ান, সিনেমা, পিকনিক, পার্টি এই সবেতে মেতে উঠেছে...."

ভানু আমাকে চিমটী কেটে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা, এবার থামো তো।"

আমি চুপ হয়ে গেলাম, আর কাকীমা হেসে ভেতরে চলে গেলেন।

বিয়ের দিন সন্ধ্যে বেলা বিবাহসভা ফুল দিয়ে সাজাতে সাজাতে যেই শুনলাম বর এসেছে, সব ছেড়ে না-ছুড়ে তখনই ছুটলাম।

অপার্থিব সৌন্দর্যের মূর্ত্তিটীকে দেখতে তর সই ছিল না। যেখানে বরযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, ওখানে সবাই ইতঃস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি রাজপুত্তুর বর মশাই-কে খুঁজছিলাম। ঠিক ঐ সময় একটা ঘর থেকে চারপাঁচ জন স্যুটবুট এঁটে বীরদর্পে বেরুচ্ছিলেন খুব সম্ভব এঁরা সব রাজপুত্তুরের সখাবৃন্দ। আমি ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লাম। কাপড়-চোপড় বদলাবার পর বর একাই বসেছিল। পরণে সাদা ধপধপে লুঙ্গি ও তেমনি সাদা জামা। আমি সগর্ব্বে নমস্কার করলাম।

"নমস্কার! আসুন!"

"আমি ভানুমতীর ভাই কেশব রাও। আপনাকে দেখার জন্য..."

"বসুন! বসুন!"

আমি অন্য চেয়ারটায় বসে পড়লাম। আমার দিকে সিগারেট বাড়াতে, হেসে বললাম, "না, থ্যাঙ্কস, আমার সিগারেট খাওয়া অভ্যাস নেই।"

"আজকাল সিগারেট না খাওয়া...অদ্ভুত ব্যাপার, না?" বলে উনি সিগারেট জ্বালিয়ে পা ছড়িয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। ফর্সা রং, ছিপছিপে গড়ন—সুপুরুষ বলবার যোগ্য। চুল আঁচড়ানোয় কোন বিশেষত্ব নেই। চেহারা বেশ ভরা ভরা কিন্তু বক্ষ উন্নত নয়। তবুও ভানুর বর হবার উপযুক্ত। কথাবার্তা কমই বলছেন। বোধহয় 'বর' হয়েছেন বলে খুব গর্ব্ব হয়েছে।

"আপনাকে দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল। আপনার বিষয় আমার বোনকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বলেছে আপনি দিব্যকান্তি, বীরশিরোমণি।"

উনি হাসতে হাসতে বললেন, "উনি বোধহয় যাত্রা টাত্রা বেশী দেখেন, তা আপনার কি মনে হল?"

"ভারী কঠিন প্রশ্ন। তা আমি তো মেয়ে নই ..."

এই রকম হাসি তামাসা আধঘণ্টা ধরে চলল। উনি বেশ

উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিলেন। কনের সজ্জায় সজ্জিত ভানুকে আমি সব বললাম, "রত্ন, পাদুকা ইত্যাদি কিছু নেই, আমি জিজ্ঞাসাও করেছি ওঁকে। তুমি কি মনে কর ওসবগুলোকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন ?"

ভানু রাগ করে মুখ গোঁজ ক'রে বসল। গালের উপর কাজলের দাগ[1] আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল।

"তোমরা দু'জনে তো বেশ মজায় আছ। মাঝ থেকে আমার উপর রাগ করার কি অর্থ ?" বলে আমি বেজার হয়ে বসলাম।

ভানু চোখ নীচু ক'রে একটু হাসল। বিয়ের কনের আশা আকাঙ্খায় ভরা হাসি বোধ হয় এমনই হয়। কত সহস্র ভাব ও আকাঙ্খা ফুটে উঠছিল ওর হাসিতে।

ভানুর বর যখন ওর গলায় মঙ্গলসুত্র পরাচ্ছিল তখন আমার বুকে কেমন যেন হতে লাগল। যেন আমি সব কিছু হারিয়ে ফেলছি। ভানু আর এখন আমার বোন নয়, রাজ শেখরমের স্ত্রী। এখন নিজের ভাইএর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করা, হেসে খেলে কাটানো আর সম্ভব নয়। সবায়ের সঙ্গে আমিও 'অক্ষত' দিয়ে আশীর্ব্বাদ ক'রে নিঃশব্দে চোখ মুছলাম। মনে মনে বললাম, আমার বোন দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে থাকুক, সৌভাগ্যবতী আর পুত্রবতী হোক।

বর এবার জামাইবাবু হয়ে গেলেন। যতদিন জামাই আছেন ততদিন থাকতে কাকীমা আমাকেও অনুরোধ করলেন। পর দিন হাসি-ঠাট্টা আমোদ আহ্লাদে কেটে গেল। একবার হাসতে হাসতে আমি বললাম, "দাদা, আপনার খুব ভাগ্যের জোর, আমার বোনের মত স্ত্রী পেয়েছেন।"

"না, না, আমার মত স্বামী পেয়েছে, তোমার বোনই ভাগ্যবতী।"

"নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করছেন যে।"

"আর কেউ নেই তো, কি করবেন বলো ?" বললে ভানু। তিনজনেই হেসে ফেললাম।

---

[1] অন্ধ্রে বর কনের গালে কাজলের তিল আঁকে যাতে নজর না লাগে।

বিয়ে হতে না হতেই জামাইবাবু কোন না কোনও ছুতোয় ভানুকে ডেকে ওকে দিয়ে কাজ করাতে লাগলেন। কখনও চিরুণী আনতে বলতেন, কখনও সার্টটি একটু ঠিক করে দিতে বলতেন, নয় তো বা জুতো বুরুশ ক'রে দিতে। ভানু ওঁর সব হুকুম তালিম করতে কিছুটা লজ্জা পাচ্ছিল। কোন দোষ হলে বা কাজ করতে দেরী হলে উনি বিরক্ত হতেন। ভানু একেবারে দমে যেত। এ সব উনি ধরতে পারতেন কিনা বলা কঠিন। অন্ততঃ আমার মনে হত এ সব উনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। আমার একটুও ভাল লাগছিল না। ভানুর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। হঠাৎ কোনও ভুঁই ফোড় এসে যেন ভানুর উপর হুকুম চালাচ্ছে। আহা, উনি যদি বুঝতে পারতেন—ভানুর মন ফুলের মত নরম, ওকে কোনও রকম কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়।

যাবার আগে ভানুর সঙ্গে নিভৃতে দেখা করলাম। "ভানু, তোমার ভবিষ্যৎ যাতে সুখের হয় তার দায়িত্ব তোমার। মনে হচ্ছে, জামাইবাবু একটু রাগী। এখানে মায়ের সঙ্গে যেরকম রেগেমেগে কথা বলতে এঁর সঙ্গে তেমন করলে চলবে না। সবদিক থেকে উনি তোমার উপযুক্ত স্বামী। সাবধান হয়ে, ভালভাবে, শান্তিতে..." বলতে বলতে আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। খেলাধূলায় অভ্যস্ত ভানুর উপর যেন বোঝা চাপান হচ্ছে, ভানুকে যেন পরের হাতে তুলে দিচ্ছি।

"দাদা!..." বলে ভানু একটুক্ষণ কিছুই বলতে পারল না—পরে মাথা নীচু করে বললে, "ওঁর বিষয় আমার কোনও ভয় নেই, সত্যি বলতে কি আমি খুশি হয়েছি।" ভানু মন খুলে শুধু আমারই সঙ্গে কথা বলে।

"ভানু তোমার বিয়ের নিমন্ত্রণ পাবার পরই জামাইবাবু কেমন হবেন সে বিষয় আমার মনে একটু ভাবনা ছিল। কিন্তু এখন আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি।"

তারপর আমার পড়াশুনার বিষয় কথা হলো। ভানু বললে,

"ডাক্তারী পড়ো, সেটাই ভালো।" আমি বললাম, "এখন আর আমার ও লাইনে যাবার ইচ্ছে নেই। বি.এ. ক্লাসে ভর্ত্তি হচ্ছি। কেমন ?"

ভানু চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, "তা বেশ।"

তৃতীয় মাসে ভানু জামাইবাবুর কাছে চলে গেল। নিজের নূতন ঘরকন্না, জামাইবাবুর খিটখিটে স্বভাব, ঘরের কাজকর্ম্ম সব খবর দিয়ে খুব বড় বড় চিঠি লিখত। দিনগুলি কেমন আয়েশে কাটছে, ওঁর ভুরু সবসময় কুঁচকেই আছে। ভোরের অন্ধকারে উঠে ঘরের কাজে লেগে যেতে মন চায় না। কখনো মনে হয়, এ ঝামেলায় না পড়লেই হত, সময় সময় মন একেবারে বিদ্রোহ করে বসে, আবার খানিকবাদে মনটা নরমও হয়ে যায়। সব চেয়ে ভাল লাগত যখন বুঝতাম ও আমার কথা প্রায়ই ভাবে। আমার বোনের বিবাহিত জীবন সবে শুরু। যাতে সে সহিষ্ণু হয়, সে বিষয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা উচিত মনে হ'ত, পরামর্শ দিতাম।

বছর ঘুরতেই ভানু মা হল। ফুটফুটে ভাগ্নেকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মা, বাপ উভয়ের সৌন্দর্য ওর মধ্যে ফুটে রয়েছে। ফর্সা রং, মিষ্টি চেহারা, ভারী সুন্দর দেখতে। একবছর হতে না হতে হাঁটতে শিখে গেল, টলমল ক'রে ওকে হাঁটতে দেখে যেন আর আশ মেটে না। ভানু খুব ভাগ্যবতী, সব দিক থেকে সে সুখী। এই দু'বছরের মধ্যেই ও কত বদলে গেছে। যেন ক্ষমা, শান্তি, সহিষ্ণুতার মূর্তি।

"তুমি অনেক বদলে গেছ ভানু!" বলতে গিয়ে আমার আওয়াজ একটু ভারী হয়ে উঠল। "আমরা যখন স্কুলে পড়তাম, কি ভালই লাগত তখন। সে সব দিন আর ফিরে আসবে না, না ?"

ভানু কেমন অদ্ভুতরকম হেসে উঠে বললে, "সে দিন যদি ফিরেও আসে দাদা, তো শুধু একজন ভাই-এর স্নেহে আর আমার তৃপ্তি হবে না।"

আমি কিছু বুঝতে পারলাম না, জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে ?"

ভানু পরিষ্কার জবাব না দিয়ে বলল, "ও কিছু নয় দাদা! এ সব কথা ছাড়ো।"

"তুমি তো পাকা গিন্নীর মত কথা বলছ, আমাকে কি কচি খোকা ঠাউরেছ? তুমিই তো আমার থেকে ছোট—"রাগের ভান ক'রে বললাম। ভানু হেসে ফেলল। কেমন যেন ফিকে হাসি—কোথাও যেন রিক্ততার আভাস।

পরীক্ষার ফল বেরুবার পরই ভানুকে খুশি হয়ে খবর দিলাম। "এম.এ পড়বার জন্য তোমাদের ওখানেই আসছি। একবার মনে হচ্ছে ওখানে না যাওয়াই ভালো, আবার দেখছি তোমার কাছে যাওয়ারও টান রয়েছে—।" মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ওদের স্বচ্ছন্দ জীবন যাত্রা পথে আমি একটা বিঘ্ন না হয়ে পড়ি। শুধু তাই নয়, ভানুর সঙ্গে সারাদিন গল্পে-শল্পে মেতে থাকলে আমারও পড়াশুনা ভালমতো হবে না। শেষে ঠিক করলাম ভানু যতই আগ্রহ দেখাক না কেন আমি ওদের ওখানে থাকতে রাজী হব না। তবে শেষ পর্যন্ত এ সমস্যা উঠল না। ভানু চিঠিতে এ বিষয়ে কোনও কথাই তোলেনি। সে লিখছে, ও আমার আসার প্রতীক্ষায় আছে, কখন আমার কোলে মুখ গুঁজে কাঁদতে পারবে। পাগলী কোথাকার!

য়্যুনিভার্সিটিতে টাকা জমা দিয়ে হোস্টেলে ভর্তি হয়ে গেলাম। ঘরে জিনিস পত্তর রেখে একটু গা এলিয়ে দিলাম। মা যে কড়াই-এর ডালের নাড়ু আমার জন্য দিয়েছিলেন সেই কৌটোটি থলিতে নিয়ে সন্ধ্যাবেলা বেরুলাম। ভানুর সঙ্গে মাস কয়েক আগে দেখা হয়েছিল। এবার ওকে খুব রোগা দেখলাম। আমাকে দেখতেই হেসে আমার হাত ধরে ফেলল—যেন হারানো কোনও ধন ফিরে পেয়েছে।

"কেমন আছ? ভালো তো? আমি তো কাল থেকেই প্রতীক্ষা করছি। অবশ্য তোমার চিঠি দেরীতেই পেয়েছি। জ্যাঠাইমা আর বাড়ীর সকলে ভালো আছেন তো? ওঃ, কত লম্বা হয়ে গেছ!" একের পর এক প্রশ্ন করেই চলল। তারপর আমার

উত্তর না শুনেই হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেল। একটা টুল নিয়ে ওর ছেলে ওখানে খেলা করছিল। ওকে টেনে আনতে আনতে বলল, "বিট্টু, তোর মামা এসেছে, মামা! জিজ্ঞেস কর তোর জন্য কি এনেছে?"

ও হেলে দুলে আমার দিকে এগুতে আরম্ভ করল। আমি বললাম, "বিট্টু, আমি তো কিছু আনি নি।"

ভানু হেসে বলল, "মামা হওয়া কি এতই সহজ ভেবেছ? বিস্কুটও যদি না দাও তো ও ভীষণ রেগে যাবে।"

"তোমার ছেলে তাহলে বিয়ের তত্ত্বে শুধু বিস্কুট পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে?" বলতে বলতে বিট্টুর হাতে বিস্কুটের টিনটা দিলাম। ভানু সগর্বে বললে, "আপাততঃ এই যথেষ্ট।" ছেলের মা যে।

বিট্টু বিস্কুটের টিন খুলে বাছতে আরম্ভ ক'রে দিল। আমরাও গল্পে মেতে উঠলাম। কথায় কথায় ভানু আমার বিয়ের কথাও তুলল। আমি যার স্বামী হবো তার ভাগ্য ভালো। ওর মতে এ সৌভাগ্য সুশীলারই প্রাপ্য। সুশীলা আমার মামার মেয়ে[১], ভানুর প্রিয় বান্ধবী। ওর জন্ম হবার পর থেকেই সবাই ওকে আমার বাগদত্তা বলে ধরে নিয়েছে। এ কথাটি কতদূর সত্যি তা অবশ্য আমার বাবা, কিংবা ভগবান যদি থাকেন, তাঁরাই জানেন। বাবা এ বিষয় কখনো কোনো উল্লেখ করেন নি আর ভগবানকে তো দেখতেও পাওয়া যায় না, তাহলে এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হবে কি করে? আমার কিন্তু কোনও আপত্তি নেই বরং খুশিই হব। অবশ্য নিজের বিয়ের কথা এখন পর্যন্ত আমি ভাবিও নি। কিন্তু ভানুকে এ কথা বললে তো ও বিশ্বাস করবে না।

ও বললে, "তোমার চালাকি কি আমি বুঝি না? তুমি নিজেই চাও না অথচ দোষ জ্যাঠামশাই-এর ঘাড়ে চাপাচ্ছো। তুমি যদি চাও তো কেন হবেনা? কে তোমাকে আটকাবে?"

---

[১] অন্ধ্র সমাজে মামার ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিয়ের রেওয়াজ আছে।

আমার হাসি পেলো। বললাম, "সুশীলা ছাড়া এ সংসারে আর কি কোন মেয়ে নেই ?"

ভানু ব্যঙ্গ ক'রে বলল, "রাও সাহেব, পৃথিবীতে মেয়ের অভাব নিশ্চয় নেই।" কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকার পর আবার বলল, সুশীলা তোমাকে যেরকম শ্রদ্ধা করে তা তুমি বুঝবে না। তোমার প্রতি ওর যেমন অন্তরের টান আছে সেরকম আর কোনো মেয়ের হতেই পারে না। যখন থেকে ওর জ্ঞান হয়েছে তখন থেকেই তোমাকে যেমন শ্রদ্ধা..."

"এর জন্য তুমি দালালি বাবদ কিছু পাবে না তো ?"

ভানু চুপ ক'রে রইল। কিন্তু একটু পরেই আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে বলল, "ও আমাকে কথা দিয়েছে যে আমার ছেলের বউ, তোমার মত গুণী ও তার মত সুন্দর হবে।" ভানুর চোখে হাসির ছটা দেখে আমার লজ্জা করতে লাগল। ভানু কিরকম বড়দের মত নিঃসঙ্কোচে এ সব কথা বলতে শিখে গেছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম।

রাগের ভান ক'রে বললাম, "কার ভরসায় ও তোমায় কথা দিয়েছে ?"

"আমি কি জানি ? ওকেই জিজ্ঞাসা করো।"

তারপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "জামাইবাবু এখনো এলেন না ?"

"আটটা বাজে, এলেন বলে।"

"ওঁর কি খবর ? মেজাজ কিরকম ?"

ভানু হেসে বলল, "কাল থেকে তুমি নিজেই দেখতে পাবে।"

নটা বেজে গেল। ভানু বারবার আমায় খাবার কথা বলছিল। আমি বললাম, জামাইবাবু আসুন না, তারপর একসঙ্গে খাবো। "প্রায় আধ ঘণ্টা পরে উনি এলেন। পরে জানতে পারলাম উনি রোজ এসময়ই বাড়ী ফেরেন। পরে চাকরী ও ঘরের বৌয়ের মধ্যে সর্বদা রেষারেষির সম্বন্ধ।

আমাকে দেখে উনি বললেন, "কেমন আছেন? আসতে না আসতেই হোস্টেলে থাকার সখ হল কেন? অন্ততঃ দু'চার দিন তো এখানে থাকতেন, তারপর...।"

"স্টেশন থেকে সোজা ওখানে চলে গেছি। জিনিস পত্তর রয়েছে, বার বার এখানে ওখানে নিয়ে যাওয়া..আপনি কেমন আছেন? বেশ ভালো তো? রাত দশটা পর্যন্ত এ আবার কেমন চাকরী? এতক্ষণ স্ত্রীকে একলা থাকতে হয়।"

"তাতে কি হয়েছে? তোমার বোন তো ধৈর্যের অবতার। আমি এখনি স্নান ক'রে আসছি", বলে স্নানের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

খাবার পরই আমার ঘুম পেয়ে গেল। ভানুরা সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে জেনে, ওদের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন বোন ও ভাগ্নের জন্য কিছু কেনাকাটা ক'রে আর ওখানেই রাতের খাওয়া সেরে আসা এক রকম নিয়ম হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু জামাইবাবুর সঙ্গে কচিৎ কখনো দেখা হত। বাড়ীতে খুব কমই থাকতেন। ভানু কখনো বই পড়ে, কখনো সেলাই করে কিংবা ছেলের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটাত। আমাকে দেখলেই তাড়াতাড়ি আমার হাত ধরে ফেলত। যেন নূতন প্রাণ পেল।

—"এরকম একলা থাকা তুমি কি করে সইতে পারছ ভানু?"

আমার এ কথার উত্তরে ক্ষুণ্ণ স্বরে বলতো, "কি করা যায় বলো?"

ভানুর মনে সুখ নেই। অশান্তির আগুন ওর ভেতর অহরহ ধিকি ধিকি জ্বলছে, দু'তিন মাসের মধ্যেই টের পেয়ে গেলাম। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এর কারণ কি হতে পারে? অনেক ভেবে চিন্তেও কূলকিনারা পেলাম না। ভানু যেন কি রকম হয়ে গেছে। কোনো কাজেই উৎসাহ নেই। জামাইবাবু কিছু করতে বললে কখনও নীরবে ক'রে দেয় কিংবা কখনও বেশ রুক্ষ স্বরে সোজা না বলে দেয়। সন্তান হবার পর মা-বাপের মধ্যে খিটমিট কম হতেই দেখেছি, কিন্তু এখানে তার একেবারে উল্টো। ছোট

ছেলে আধো আধো কথা ব'লে বাড়ীময় খেলে বেড়ায়, কিন্তু বাপ আসতেই তার সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। বাপকেও কখনো ছেলেকে কোলে নিতে বা আদর করতে দেখি নি।

নানান দুশ্চিন্তায় পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ মনে হলো, দূর আমি সব আজেবাজে ভাবছি। হয় তো এ সব কিছুই নয়। খুব সম্ভব ওরা সুখে-সচ্ছন্দেই আছে। কিন্তু এমনই যদি হবে তো ভানুর মুখে এতটুকুও হাসি কি লেগে থাকত না? ওর উজ্জ্বল চোখের দীপ্তি কোথায় গেল?

ভানুকে জিজ্ঞেস না ক'রে কি ক'রে জানতে পারা যায়… কিন্তু কিই বা জিজ্ঞাসা করব?

আমি যা ভয় করছি তাই যদি হয়?

আর কিছু ভেবে যদি ভানু দুঃখ পায়?

শনিবার সন্ধ্যায় ওদের ওখানে যখন গেলাম জামাইবাবুও বাড়ীতে ছিলেন। দু'জনের মধ্যে বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্তা হচ্ছিল। এমনটি আর এর আগে কখনো দেখি নি, তাই কিছু আশ্চর্যই লাগল।

"কি ব্যাপার রাও সাহেব? আপনি যে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ……আপনাদের দু'জনকে…" বলতে গিয়ে হেসে ফেললাম। সেদিন উনি বেশ খোশ মেজাজে বসে আলাপ করলেন।

"আপনি কি ঠিক করেছেন রাও সাহেব, পড়াশোনা শেষ করে বিয়ে করবেন? নিশ্চয়ই বড় ভাগ্যবতী হবে সে মেয়েটি……আমি তো ভাবছিলাম আপনার বিয়েতে বেশ কয়েক দিন ধরে আমোদ-আহ্লাদ করবো। কিন্তু আপনি তো…"

ভানু বলল, "এ আর কি এমন কথা। শ-খানিক টাকা খরচা করলে হোটেলে কত রকম সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার করা যাবে। কেন দাদা, আমি কি কিছু ভুল বলছি?"

"দাদা নয় গো দিদি বল। তুমি কি তোমার দাদার মধ্যে কোনও পুরুষত্ব দেখতে পাও ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, জহুরীই জহর চেনে।"

"ঠাট্টা তামাশা কি শুধু তুমি আর তোমার ভাই-ই করতে পারো ? সত্যি বলতে কি আমি তোমার ভাই-এর মত বড় লোক হলে বাড়ী থেকে বেরুতে হলে মোটর গাড়ীতেই চড়তাম ..."

"...আর মোটরে করে সোজা ক্লাবে।"

"না তো কি ? তোমার ভাই-এর মত ঘরের কোণে পর্দ্দানশীন হয়ে বসে থাকতাম।"

ঘণ্টাখানেক এই ধরণের কথাবার্তা চলল।

উনি বললেন, "কাল আমরা কোথাও পিকনিক করব।"

ভানুর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সে কি খুশী। আমিও তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—বাঃ বেশ হবে, কোথায় যাওয়া হবে, ক'টার সময় বেরুন হবে, সঙ্গে কি কি নিয়ে যাওয়া হবে সব পরামর্শ হল। জামাইবাবু তেঁতুল ভাতের আব্দার ধরলেন, আমি বললাম, কচুরী—ভানু নারকলের হালুয়া। শেষ পর্যন্ত তিনটে জিনিসই অল্প অল্প পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা হলো। ঘুমোবার আগে পর্যন্ত এইসব কথাবার্তা চলল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ভানুকে সুখী বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

ভোর তিনটেয় উঠে ভানু উনুন জ্বালিয়ে রান্না-বান্না করতে আরম্ভ করল। আলো জ্বালিয়ে আলমারী থেকে কিছু জিনিস বের ক'রে ও আমার খাটের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, "কখন উঠলে ভানু ?"

"আরে, তুমি জেগে আছ ? এখন আমার ঢের কাজ, তুমি ঘুমোও" বলে আলো নিভিয়ে চলে গেল। ঢেকেঢুকে শুলাম কিন্তু ঘুম আর এলো না। ভানু বেচারী অন্ধকার থাকতে উঠে কাজে লেগে গেছে। ভাবলাম আমিও কিছু সাহায্য করি গিয়ে। যদিও

রান্নার ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ তবুও গিয়ে পিঁড়ি পেতে রান্না ঘরে বসে গেলাম।

চাল ধুতে ধুতে ভানু বললে, "এত শীগগির কেন উঠলে?"

"আর ঘুম আসছিল না, ভাবলাম তোমার সঙ্গে গল্প করি।"

"সত্যি তুমি খুব ভাল ছেলে, নারকল কুরতে পারবে?"

সেই অন্ধকারে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে এলাম। নারকলের জলটা আমিই খেয়ে নিলাম। কাজ করতে করতে ভানু বলল, "এখন পর্যন্ত নারকলই কুরছ?...আচ্ছা। দেখ, শিলে এলাচ রেখে দিচ্ছি, এ গুলোও বেটে দিও। তারপর কাজুর খোসা ছাড়িয়ে দিও। সব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে, বুঝেছ?"

"বারে বা! সকালের মধ্যেই সব কাজ শিখিয়ে দেবে না কি?" আমি ধীরে ধীরে নারকল কুরছিলাম।

"এ তো ভালই কথা। তোমার স্ত্রী আরামে থাকবে।"

"ওর আরামের জন্য আমায় কি এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে?"

"সেও তো তোমায় সুখ দেবার জন্য কতকষ্ট সইবে?"

"কিন্তু কাল থেকে তুমি একটু বেশীই কথা বলছ।"

"আচ্ছা দাদা, বলো দিকিনি, বছরে একবারও যদি স্বামী-স্ত্রী, দু'জনে রান্না ঘরে বসে গল্প করতে করতে এক সঙ্গে কাজ করে তাহলে কি ভালোই যে লাগে, না?"

"নিশ্চয়! এতে কি কোনও সন্দেহ আছে?...তাহলে জামাই-বাবুকে ডেকে আনি?"

"হ্যাঁ, ডেকে আনো যদি তোমার ভয়ডর না থাকে।"

"ওরে বাপরে, উনি লোকের গায়ে হাতও তোলেন না কি?"

আগেকার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল, যখন ভানুর বিয়ে হয়নি। "এতশত কাজ তুমি কি করে শিখলে ভানু! আগে তো কফিও করতে পারতে না, সাতটা পর্যন্ত কুম্ভকর্ণের মত পড়ে পড়ে ঘুমোতে। কিন্তু এখন..."

"আজ প্রথম তোমার মুখে নিজের প্রশংসা শুনছি। আমি কৃতার্থ হলাম।"

"এমন কেন বলছ?"

ভানু উত্তর দিল না। প্রসঙ্গ বদলে নিয়ে বলল, "এলাচ বাটা হয়ে গেছে? কাজুর খোসা ছাড়িয়েছো? ...ছিঃ ছিঃ একি করলে? ভেবেছিলাম কাজে খুব এক্সপার্ট তুমি, তার জন্যই কাজ দিয়েছিলাম। খোসা, বাকলা এক করে দিয়েছ যে। খোসাগুলোও বেটেছ?" বলে আমায় ধমক দিয়ে, সব কাজ আবার নিজের হাতে তুলে নিল। আমার অভিমান হল।

ছটা বাজতে বাজতে দুটো টিফিন কেরিয়ার ভরে নেওয়া হলো। জল গরম ক'রে ভানু বিট্টুকে নাওয়ালো। নিজেও স্নান সেরে ফিকে নীল রঙের জরির শাড়ী পরে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

জামাইবাবু ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গছিলেন এমন সময় ভানু ওঁকে টুথব্রাশ দিল। স্নান করে আসতে না আসতেই কে যেন দৌড়ে এসে বললেন, "রাজু! রাতের ডাক গাড়ীতে রামু এসে গেছে। আজ রবিবার না? কফি খেয়েই ওখানে আসবে।"

জানিনা কি রকম খবর ছিল যা শুনে জামাইবাবুর চেহারা মূহুর্ত্তের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"রামু এসে গেছে? কি খবরই শোনালে তুমি! তুমি এগোও আমিও এখনি আসছি। রাস্তায় মূর্তিকেও খবর দিয়ে যেও।"

ওঁকে বিদায় করে জামাইবাবু ঘরে ঢুকলেন। ভানুকে বললেন, "আমার কাপড় চোপড় বের করে দাও, আজ বোধহয় দুপুরে খেতে আসবো না। আর দেখ, মোজাগুলোও যদি ময়লা হয় তো বদলে দিও।"

ওঁকে এভাবে একের পর এক হুকুম চালাতে দেখে আমি তো অবাক। রাত্তির বেলা কি ঠিক হয়েছিল, সবই কি ভুলে গেছেন?

ভানু হেসে বলল, "আজ বাগানে যাবার কথা ছিল না? টিফিন কেরিয়ারও ভরা হয়ে গেছে।"

"বাঃ কত বড় কাজ করেছো। বাগান তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। আসছে সপ্তাহে যাব—কি বলেন রাও মশাই, টিফিন কেরিয়ার ছু'টো খুলে ভাই বোনে আনন্দ করে খেয়ে নেবেন। যেন হোটেল থেকেই আনানো হয়েছে। কেমন?" হাসতে হাসতে বললেন রাজ শেখরম।

এসব মোটেই ভাল লাগল না আমার। একটু হেসে চুপ করেই রইলাম। কাপড়চোপড় বদলে উনি চলে গেলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব ওলটপালট হয়ে গেল। আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। পিছন ফিরে চাইতে দেখলাম, ভানু মাথা নীচু করে বিষণ্ণ মুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওর চোখে জল।

"পাগলী কোথাকার! এইটুকুতেই কাঁদছ? তুমি তো বড় অদ্ভুত বাবা। অন্য দেশ থেকে কারুর বন্ধু এলে খুশী হওয়াই তো স্বাভাবিক। পিকনিকের জন্য ভেবো না। আর কখনও যাওয়া যাবে। এসো বসে গল্প করি। জামাইবাবু তো ঠিকই করেছেন।" বলে ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম।

ভানু চোখ মুছতে মুছতে বলল, "তুমি জান না দাদা। উনি বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যান নি। এই তাস খেলার জন্য আমার জীবনে এক ফোঁটা সুখ নেই।"

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। "কি বলছ ভানু !"

"হ্যাঁ দাদা, কিন্তু এসব তোমার কাছে কি করে বলি আমি?"

নিজেই পিকনিকের প্রোগ্রাম করলেন। মাঝরাত থেকে উঠে ভানু সব বন্দোবস্ত করল। শেষ পর্যন্ত সব কিছু ফেলে গেলেন কোথায়—না তাস খেলতে! আমার আশ্চর্যের সীমা রইল না। উনি তাস খেলতে গেছেন বলে আশ্চর্য হই নি বরং ভানু কি করে এসব সহ্য করছে, ওঁর সঙ্গে থাকছে ও কাজকর্ম চালাচ্ছে—সেটাই আশ্চর্য। আমি জানতাম তাস খেলার প্রতি ভানুর ভীষণ ঘৃণা। একবার ও বলেছিল—'কোনো স্ত্রীরই তার স্বামীর তাসের নেশাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।"

আমি তখন বলেছিলাম, "দেখ ভানু ! এত শীগগির তুমি মতামত প্রকাশ করো না। কারুর কারুর পক্ষে আজকাল তাস খেলা খাওয়ার চেয়েও বেশী আবশ্যক। তাই এসব জিনিসকে এত ঘেন্না করলে কি চলে ?"

ভানু কেমন ভাবে আমার দিকে চেয়ে বলেছিল, "দাদা! তোমার এ বিষয় সত্যিই এইমত ?"

আমি তখন বলেছিলাম, "যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হল ধর তার খেলার সখ আছে। তখন কি করবে ?"

"কি করবো ? ওঁর ঐ অভ্যাসটি ছাড়িয়ে দেবো।"

কত দৃঢ় মনোবল ছিল ওর।

"ও যদি তোমার কথা না শোনে ?" জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

"তুমি এরকম কথা কেন বলছ ? স্বামী-স্ত্রী যদি একজন অন্য-জনের কথা না শোনে তো স্বামী স্ত্রী কিসের ?"

আমার আরও কিছু বলবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এর চেয়ে বেশী আর কিই বা বলতে পারতাম ?

সেই ভানু আজ বিছানার পড়ে কেঁদে মরছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ বাড়ীর রহস্য এক এক করে আমার সামনে উদ্ঘাটিত হতে লাগল। এর আগে ভানুকে কখনও কাঁদতে দেখি নি। ওর কান্না আমি সইতে পারছিলাম না। আস্তে আস্তে ওর কাছে গিয়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলাম।

"কি ভানু ? কাঁদছ কেন ?"

একটু পরে চোখমুছে ও বলল, "এই আমার সম্বল। কান্নার পর একটু হাল্কা লাগে।"

ওকে আর কি বলবো ? ভানুর জীবনে সুখ নেই। যা ভয় করেছিলাম দেখছি তাই সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, "ভানু ! তুমি তো এত বুদ্ধিমতী, জামাইবাবুকে বদলাতে পারলে না ?"

"বুদ্ধির জোরে কি পাথরকে মানুষ করা যায়? আমি কখনও ভাবি নি মানুষও পাথর হ'তে পারে।"

"দেখ ভানু! এটা তোমার বাড়াবাড়ি! কাউকে পাথর বলতে গেলে তার অনেক দোষ বার করতে হবে। তাস খেলা তো অতি সাধারণ ব্যাপার।"

ভানু উত্তর দিল না। আমি আবার বল্লাম, "তুমি চেষ্টা করেছিলে?"

ভানু কেঁদে ফেলল। বলল, "আমি হেরে গেছি দাদা, একেবারে হেরে গেছি। আজ আমার সব অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেছে। এই দু'বছরে আমি অনেক কিছু বুঝেছি।" বলে আঁচলে চোখ ঢাকল। তারপর আবার বলল, "আজ পর্যন্ত আমি নিজের সুখ-দুঃখের কথা কাউকে বলি নি। সুশীলা কিংবা মাকেও নয়। যখন মন খুবই খারাপ হয়ে যেত তখন শুধু তোমাকেই আমার দুঃখের কথা শোনাতে ইচ্ছে করত। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে? তুমি তো জানো যে আমি সুখে আছি…তোমাকে এসব বলবো কি করে দাদা গো?" বলে বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদতে লাগল। তবুও আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ভানু কেন এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

নীচু স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, "জামাইবাবু কি প্রায়ই তাস খেলেন?"

আমার দিকে চেয়ে সে বলল, "প্রায়? প্রায় কেন? রোজ, সবসময়, সর্ব্বদা। ওঁর ঘরবাড়ী তাস। তাস খেলাই ওঁর সংসার। ওঁর বন্ধুই ওঁর স্ত্রী পুত্র। আর কোনও কিছুতে ওঁর মন নেই। নিজের বাড়ীকে উনি নরক মনে করেন, আর স্ত্রীকে শয়তান। নিজের ছেলেটা পর্যন্ত ওঁর শত্রু। বল, কে কি করবে?"

আমি কিছুক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম।

"শুধু নিজের ভালো লাগা না লাগাকে ছেড়ে অন্যের দিকটাও তো একটু দেখ ভানু! এটা হল নূতন যুগ। তুমি এ যুগকে

স্বীকারও করো, পছন্দও কর। দেশ কালের পরিবর্তনকে আমাদেরও কিছু মাত্রায় নিজের ক'রে নিতেই হবে। বেড়ান, সিগারেট খাওয়া, তাস খেলা, ক্লাবে যাওয়া, সিনেমা দেখা এ সব নতুন যুগের দান। বন্ধু সিগারেট দিলে ধন্যবাদ বলে, নিয়ে নেওয়াই সভ্যতা। পাঁচজন তাস খেলতে বসলে যে দূরে বসে রইল তাকে ওরা অসভ্য ও ভীতু আখ্যা দেবে। রাস্তায় কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে হোটেলে নিয়ে গিয়ে অন্ততঃ কফি না খাওয়ালে আজ-কালকার শিষ্টাচারের বিরুদ্ধে যায়। সিনেমা দেখার ইচ্ছে হলে বন্ধুদেরও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। একলা যেতে লজ্জাও তো করতে পারে। ভালই হক বা মন্দই হক, কোন কোনও কাজ বাধ্য হয়ে করতে হয়। নূতন যুগের লোকেদের কাছে ভালো মন্দ বলে কিছুই নেই। তাই কোনও কাজেই লোকে সঙ্কোচ করে না। সময়ের তালে তাল দিয়ে চলতে হবে। অনেক কিছু স্বীকার করতে হবে।"

"বিয়ের সময় উনি যখন সিগারেট দিচ্ছিলেন তুমি নাও নি মনে আছে?"

"ও কথাটা এখন কেন? দু'জনের ব্যবহার একরকম কি ক'রে হতে পারে? কাল দেখ নি, জামাইবাবু আমায় মেয়ে বলে ঠাট্টা করছিলেন? আমি সিগারেট খাই না, তাস খেলি না, সাধারণভাবে থাকি, এই সবের জন্যই না? ও সব অভ্যাস যার নেই সে এদের মতে মানুষই নয়। সে ভীতু। অনেকে শুধু মান রাখার জন্যই এরকম বিলাসিতার জীবনযাপন করে থাকে। এ সব তো লোকের স্বভাবের উপর নির্ভর করে। যাই হোক্ আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, যখন যেমন অবস্থা তাকে মানিয়ে চলাই শ্রেয়। দেখো না আজকাল অনেক মেয়েরই বেশভূষা দেখলে বিরক্তি আসে। পাতলা নাইলনের শাড়ী, মাথা থেকে পা পর্যন্ত রং মাখা, অদ্ভুত-রকম চুলের বাহার, পুরুষের গা ঘেঁসে চলা—এ সব দেখে সত্যিই কি ওদের উপর বিরক্ত হতে পার? যুগ পাল্টে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে

বেশভূষাও। এ রকম সাজ গোজ তারা সবাই নিজেদের ইচ্ছে মতই করছে বলে মানতে হয়। পুরুষদের বিষয়ও ঠিক এইরকমই। তুমি ভাবছ শুধু পুরুষরা নেশা করে। কিন্তু যারা সিগারেট খাচ্ছে, পুরুষদেরও বাড়া তাস খেলছে, এমন মহিলাও আজকাল অনেক দেখা যায়। বলতো আমি দেখাতেও পারি।"

"দরকার নেই। এরকম নেই এতো আমি বলছি না। আমি কারুরই অন্যায়ের সমর্থন করছি না। ভুল যে কেউই করুক না কেন, ভুল, ভুলই। মেয়েদের বিষয় যে কথা তুমি বললে, আমার বিশ্বাস, সে অপবাদ আমাকে দিতে পার না। তুমিও সেটা জানো। বিয়ের সময় উনি আমাকে একটি নাইলনের শাড়ী দিয়েছিলেন। ও শাড়ীটি পরতে আমার একটুও ভাল লাগেনা, কিন্তু তবুও ওঁকে খুশী করার জন্যই আমি চার পাঁচবার ওটা পরেছি। এখনও ও· শাড়ীটি যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। আমি 'মেক-আপ' করি না, সাদাসিধে থাকি, সেটা ওর পছন্দ নয়। ওঁর ঐসব অভ্যাসগুলো আমার পছন্দ নয়। তুমি যেমন বলছ, খারাপ অভ্যাসকেও কিছুটা সহ্য করা যায়। ভাল, মন্দ যা কিছুই হোক্ খানিকটা পর্যন্ত তাকে সখ বলা চলে। কিন্তু সে সখ যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় সেটা হয় নেশা। বল, ঠিক কিনা? পূজা-পার্বণের দিনেও স্বামীর সঙ্গে খানিকক্ষণ আনন্দ করার সৌভাগ্য আমার নেই। একে মেনে নেওয়া কি এতোই সহজ!"

খানিকক্ষণ ভানু নীরব থেকে আবার বলল, "একদিনের কথা তোমায় বলি। সেটা শুনলে আমার অবস্থা তুমি কতকটা বুঝতে পারবে। গতবার সংক্রান্তির সময় মা আমাদের ডেকেছিলেন। আমি যাই নি। তখন পর্যন্ত এখানে কোন পার্বণে অংশ নিই নি তাই ইচ্ছে হয়েছিল এবার পার্বণের দিন এখানেই থাকবো। পূজার দশদিন আগে থেকেই কি কি করবো বড় উৎসাহে সব ঠিক করেছিলাম। পার্বণের চারদিনে কি কি শাড়ী পরবো, বিট্টুকেই বা কি পরাবো, কি রাঁধবো, জলখাবার কি তৈরী করবো—সব

জিনিসের লিস্ট তৈরী করেছিলাম। ওঁকে বলেওছিলাম। 'পূজার চারদিন[১] নানা রকম জিনিষ রেঁধে ভোজ খাব। আয়েশে বসে আমরা গল্প করবো। সন্ধ্যাবেলা কোথাও বেড়াতে যাব। আমার খুব ইচ্ছে এ পার্বণটা আনন্দে কাটাই। তোমার কাছে আমি কখনও কোনও জিনিস চাই নি, এবার কিন্তু একটা অনুরোধ রাখতে হবে। এ চারদিন তুমি বাড়ীতেই থাকবে, বেরুতে পারবে না।' কত আশা নিয়ে নিলর্জ্জ হয়ে বলেছিলাম বোলেই তো? সত্যি বলতে গেলে, স্ত্রীর পক্ষে এভাবে মুখ ফুটে চাওয়ার দরকারই বা কেন পড়বে? গৃহকর্ত্তার নিজে বোঝা উচিত। উনি কিছু না বলে একটু হাসলেন। আমার গর্ব্ব হলো, এবার আমার কথা সত্যিই শুনবেন। ভোগীর (সংক্রান্তির আগের দিন) দিন সকাল সকাল উঠে খুব উৎসাহে সব কাজকর্ম করতে লাগলাম। সকলের স্নান হয়ে গেল। চা খাবার পর উনি কাগজ পড়তে আরম্ভ করলেন, আমি রান্নাঘরের কাজ সেরে নিতে লাগলাম। সম্ভবতঃ আধঘণ্টা হয়ে থাকবে উনি রান্নাঘরের দরজার কাছে এসে বললেন, "ভানু! ভাল লাগছে না।"

আমি বললাম, "দশ পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমি আসছি, তুমি ততক্ষণ একটু বোস।"

"না না ভানু, এ ভাবে হাত পা গুটিয়ে বাড়ীতে বসে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। যাই, একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।"

"আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, বললাম, এখন বাইরে গেলে তোমার আর ফেরা হয়েছে। পার্বণের দিনেও অন্ততঃ....."

"সর্বদাই ঐ এক কথা..। পার্বণের দিনেই তো কত লোকের সঙ্গে দেখা হবে। বাড়ীতে বসে আমি করব কি?"

---

[১]অন্ধ্রে মকর সংক্রান্তি চারদিন ধরে চলে। এ সময় মেয়েজামাইকে নিমন্ত্রণ করার প্রথা আছে।

"বাড়ীতে বসে কি করব ? অদ্ভুত প্রশ্ন ! আর সবাই বাড়ীতে থেকে কি করে ? আমার সে অনুরোধ কোথায় ভেসে গেল ?" রাগ চেপে আস্তে বললাম, "আমরা দু'জনে রয়েছি তবুও তোমার এখানে ভাল লাগছে না ? তুমি চলে গেলে আমায়ও তো একলাই থাকতে হবে ?"

"তোমার মনোরঞ্জনের জন্য কি এখানে বসে থাকব ? তুমিও পাড়া বেড়িয়ে এসো।"

"আমার কান্না পেলো। বাড়ীর কর্তা বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছেন আর আমি অন্যদের দরজা ধাক্কা দিয়ে মরি ? পার্বণের দিনে নিজের বাড়ীর দরজা বন্ধ ক'রে পরের বাড়ীতে যাওয়া কি শোভা পায় ? সব বাড়ীরই কর্তারা কি যে যার বাড়ীতে নেই ? পার্বণের দিন আমরা দু'জনে একসঙ্গে আনন্দ করবো, এ ইচ্ছা তাহলে আমার আর পূর্ণ হবে না ?"

"কি অদ্ভুত তোমার প্রশ্ন ! কোথাও যেতে না চাও তো বিট্টুকে নিয়ে বাড়ীতে বসে থাক। আমি মেয়েমানুষের মত বাড়ীতে বসে থাকতে পারব না।"

আমি আর কিছু বলি নি। তরকারী কুটতে কুটতে আমি মাথা নীচু ক'রে নিলাম। চোখ থেকে অঝরে জল পড়তে লাগল। যার কাছে নিজের সুখই সব চেয়ে বড়, যে স্ত্রীকে এতটুকু ভালবাসতে পারে না, স্ত্রী ও ছেলেকে উপেক্ষা ক'রে, যে শুধু নিজের সুখের জন্য অন্য লোকের পেছনে ঘুরে বেড়ায়—এমন নিষ্ঠুর লোককে আমি আর কি বলতে পারি ? পার্বণের চারদিনও অন্ততঃ বাড়ীতে থাকার অনুরোধ করা কি এত বড় অপরাধ ?

'বিট্টুকে কোলে নিয়ে বসে আমি চোখের জল মুছতে লাগলাম। কখন যে বারোটা বেজে গেল, বারোটা থেকে তিনটে—পাঁচটা—আটটা—রাত এগারোটা বেজে গেল। তখন উনি বাড়ী ফিরলেন। আমি উঠে ভাত বাড়লাম। সকালের তৈরী করা 'পুলিহার' (টক ভাত) ও পায়স যথাপূর্ব পড়ে আছে। আমি ওসব ছুঁইও নি।

উনি এসেই বা কি হল—খাবার পর হাত ধুয়েই আবার কাপড় পরতে লাগলেন। সে সময় আমার মনের যে কি অবস্থা তা তোমাকে কি করে বোঝাবো? রাগে দুঃখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। হঠাৎ যদি আমি মাথা ফেটে ওঁর সামনে মরে যেতাম···কোনও দৈববাণী যদি ওঁকে ঠিক পথে আনতে পারত···কোনও রকমেও যদি আমি ওঁর যাওয়া বন্ধ ক'রে দিতে পারতাম।····শেষ পর্যন্ত উনি বেরুবার উদ্যোগ করতেই আমি ওঁর হাত ধরে ফেললাম। "সারারাত পড়ে আছে...আমি একলা...বিট্টুর সঙ্গে····আবার যাবে?" বলতে গিয়ে আমার গলা বুঁজে গেল।

"ছিঃ ছিঃ! কি এমন হলো যে ফুঁপিয়ে কাঁদছ? আমি কি অন্যদেশে যাচ্ছি? পুরুষ ও নারীর সমান মর্যাদা, সকলের স্বাধীনতা চাই বলে খুব তো বক্তৃতা ঝাড়তে আর একটা রাতও একলা থাকতে পারো না? বেশী ভেবো টেবো না। দরজা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।"

"অভিমান ক'রে তক্ষুণি চুপ ক'রে যেতে পারতাম। কিন্তু ওঁকে বদলানো আমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক ছিল। আমি ছাড়া সেটা আর কে করবে? নম্র হয়ে বললাম, 'সারাদিন তো ওখানেই কাটালে! রাত্তির বেলাও ঐ খেলা! আজও কি ছাড়তে পারবে না?"

"বেশী বকবক করো না। সর্ব্বদা তোমার ঐ এক ঘেয়ে কথা তো—ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-পুত্র, স্নান-খাওয়া...সারাদিন অফিসের কাজে জ্বালাতন হতে হয়। যে শুধু রান্নাঘর নিয়েই থাকে সে কি ক'রে বুঝবে পুরুষদের চিত্তবিনোদনের জন্য কি চাই। তোমাকে আমি কৈফিয়ত দিতে পারব না।"

"চিত্তবিনোদন শুধু পুরুষদেরই একচেটিয়া অধিকার নয়। মেয়ে মানুষেরও মন আছে, তারও মনোরঞ্জনের দরকার হয়—কিন্তু সেদিকে তোমার কোনও দৃষ্টি নেই!...রান্নাঘর থেকে ছুটি কি আমি পেতে চাই না?"

"কোনও দরকার নেই। সে তো তোমার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।"

"কেউ জানে না, সারারাত আমি কত কেঁদেছিলাম। কিভাবে এ সব অপমান হজম করেছিলাম। আমি কাঁদলে কার কি এসে যায়? আমি অভিমান করলে কে আমার মান ভাঙ্গাবে? ওঁর মুখের উপর ওঁর ভুল দেখিয়ে দিই বলেই না উনি আমার উপর রাগ করেন? তাই না ওঁর আমাকে ভাল লাগে না? কিন্তু ওঁর কোনও ভাল অভ্যাস না হলেও ওঁর প্রশংসা করতে হবে, ওঁকে বাহবা দিতে হবে। এ সব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"সেদিন আমি খাই নি। রাত্তির বেলাও খিদে পায় নি। কিন্তু বিট্টুকে না খাইয়ে তো রাখতে পারি না, আমি তো মা? ওকে খাইয়ে, বিছানায় শুইয়ে ওর পাশেই শুয়ে পড়লাম। কেউ ঘুমোক বা না ঘুমোক ভোর তো হবেই। সেদিনই সংক্রান্তির বড় পার্বণ, সেদিন আমার লালজরির শাড়ী পরার ও বিট্টুকে সাদা সিল্কের বুশসার্ট পরাবার কথা, আর খাওয়ার পর সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম। কিন্তু চোখের জলে কি সংক্রান্তি লক্ষ্মীর আহ্বান করা যায়? নিতান্ত সাদামাটা রেঁধে বিট্টুকে নূতন কাপড় পরিয়ে, ওকে নিয়ে বসলাম। দুপুর বারোটা নাগাদ উনি ফিরলেন। ভাত বাড়লাম। সঙ্গে চাটনী আর রসম।"

"আর কিছু রাঁধনি?"

"না।"

"কেন?"

"কার জন্য রাঁধবো?"

"আমি কি মরে গেছি?"

"........."

"পার্বণের দিন সবাই নানা রকম তরিতরকারী ক'রে খুশি হয়ে খায়। আমারই কপাল মন্দ। জানতে না, আমি খেতে আসব? না তুমি চাও, আমি বাড়ীতে খেতে না আসি?"

"আমি কি চাই, আমার মন কি চায় সব তুমি ভাল করেই জান। তোমার বাড়ীতে ফেরার কথা ছিল্ না বলেই বিশেষ কিছু রাঁধবার ইচ্ছে হয় নি।"

"ও, তার মানে এই দাঁড়াল, যদি আমি না আসি তো রান্নাবান্না না ক'রে তুমি পড়ে পড়ে ঘুমোবে! আমিও দেখে নেব, কতদিন তুমি গোঁ ধরে থাক। তোমার ইচ্ছে করুক না করুক তাতে আমার কি? পার্বণের দিনে বিশেষ কিছু তোমায় রাঁধতেই হবে। দেখে নেব তোমার কত জেদ?"

"জেদ? কোন মেয়েমানুষ জেদ ক'রে কি জিততে পারে? তোমার এ ধারণা ভুল। আমি জিদের জন্য তো রান্নাঘরের কাজ ছাড়িনি?"

"তাহলে অহঙ্কারের জন্য, না কুঁড়েমির জন্য?"

"..................."

'উত্তর দিচ্ছ না যে? কি জন্যে তুমি ভালমন্দ রাঁধোনি?'

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলাম।

'ছিঃ ছিঃ, ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই কাঁদতে বসে গেলে। পর্বটর্ব সবই ব্যর্থ হলো। সবসময় কান্না আর কান্না। সারাজীবন শুধু কান্না। বোধহয় মরবার সময়ও কাঁদতে কাঁদতেই মরবে।'

"সামান্য খেয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে একইভাবে বসে রইলাম। একজন অন্যায় ক'রে অন্য জনকে এভাবে শাস্তি দেবার দুঃসাহস পায় কোত্থেকে? এরকম দুঃসাহস সকলের হয় না কেন? একথা ঠিক কথা, পার্বণের দিনে সবাই অনেকরকম খাবার টাবার করে, কিন্তু কর্তা কি বাড়ীতে স্ত্রী ও ছেলেকে ফেলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়? কিন্তু একথা বলবারও আমার অধিকার নেই। হে ভগবান, তোমার এত পক্ষপাতিত্ব কেন? কেন একজন অপরের দাসী হয়ে থাকে? যদি মনের কথা অন্ততঃ খোলসা ক'রে বলতে পারতাম তো আমার এত কষ্ট হত না।"

"দুপুর অবধি উনি বাড়ীতে থাকবেন ভেবে আমি তাড়াতাড়ি উনুন জ্বালিয়ে সুজির নাড়ু করলাম। স্নান ক'রে এসে দেখলাম উনি ঘরে নেই। আলনাতে ওঁর কাপড়জামাও নেই। বারান্দায় চটিও নেই। এখন আশ্চর্য হওয়া বা দুঃখ পাবার কোনও শক্তিই আর আমার ছিল না। উনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তাতে আমার বলার কিছু নেই। উনি মাঝরাতে বাড়ী ফিরবেন আর আমায় হাসিমুখে ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে যত কষ্টই হোক না, সেবাশুশ্রুষায় কোনও ত্রুটি থাকবে না। কিন্তু এটাই আমার দ্বারা হচ্ছে না। আমারও অভিমান হয়। আমিও স্নেহ ভালবাসা চাই। মেয়ে হলেও তো আমি মানুষ।"

"বড় দুঃখে সেবারের সংক্রান্তি শেষ হল। মার কথা শুনে যদি বাপের বাড়ী চলে যেতাম তো ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব, সবারই স্নেহ পেতাম, মার কোলে মুখ........."

"সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে আমি কেন এটা চাইলাম ? আর কি পেলাম ?"

"পার্বণের পরে তাড়াতাড়ি চিঠি লিখতে বলেছিলেন মা। মাকে খুশি করার জন্য বানিয়ে বানিয়ে সব মিছে কথা লিখতে হবে। চার দিনের দিন সকালবেলা চিঠি লিখতে বসলাম ঃ

'স্নেহময়ী মা,

আমরা সব ভাল আছি। আশা করি তোমরা সবাই কুশলে আছ। বিট্টুর স্বাস্থ্য ভালোই। আমরা পার্বণের দিন খুব আনন্দে কাটিয়েছি। ভোগীর[1] দিন সাদা জরির শাড়ী পরেছিলাম। বড় পার্বণের (সংক্রান্তি) দিন ছোড়দির দেওয়া লাল জরির শাড়ী পরেছিলাম। আমার সাধ্যমত চারদিন ধরে নানারকম খাবার করেছি, তবুও মনে হচ্ছে তোমাদের কাছে থাকলে আরও আনন্দ পেতাম।

[1] সংক্রান্তির আগের দিন।

চোখের জল টপ ক'রে লেখার উপর পড়ে গেল। আঁচলে চোখ মুছলাম। কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। গিয়ে দরজা খুললাম। উনি তাড়াতাড়ি খাটে এসে বসে পড়লেন, চোখ দু'টো ওঁর লাল।

"আমি তাস খেলি বলে তুমি সব সময় তো রাগারাগি কর কিন্তু জান, আজ খেলায় আমি কত জিতেছি? একশ ত্রিশ টাকা চারদিনে। তোমার কথা শুনে বাড়ী বসে থাকলে এতগুলো টাকা কোত্থেকে পেতাম? এই নাও পঞ্চাশটি টাকা, নিজের মনের মত একটি শাড়ী কিনে নিও।"

"আমার হাসি পেলো। এ হাসির মানে কি ওঁর মত লোকের বোধগম্য হবে না। নানা চিন্তায় পড়লাম। ইচ্ছে হল বলি, 'পাপের পয়সার লোভ ছাড়তে পারো না, বদমায়েস! তুমি কি ভাব সবাই তোমার মত মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। যাকে আঘাত দিয়েছ তাকে পয়সা দিয়ে ভোলাতে পারবে? তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে তোমার স্ত্রী ও ছেলের কি অবস্থা তা কি তুমি কখনও বুঝতে পারবে? এই বাজে পয়সার পেছনে নিজের পরিবারকে যে কাঁদাতে পারে, তার কি হৃদয় বলে কিছু আছে? স্ত্রীর কান্নাতেও যার মন গলে না সে কি একটা মানুষ? এ যে কত সত্য সে কি তুমি কোনদিনও বুঝতে পারবে?' এ সব কিছুই খোলাখুলি ওঁকে বলে দেবার জন্য মন খুবই উতলা হয়েছিল কিন্তু মনের লাগাম টেনে একটু হেসে বললাম, 'যদি গা ঢাকবার কাপড় না জোটে তো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে নিজের লজ্জা নিবারণ করবো, কিন্তু এ পাপের পয়সায়......'

'হাঃ হাঃ হাঃ', সশব্দে হেসে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ কি আদর্শবাদী মহিলা। যদি প্রত্যেক মেয়েই এরকম শুকনো আদর্শ নিয়ে থাকে তো......'

'...এ অবস্থার কবে উন্নতি হয়ে যেতো।'

'না, তা নয়। পুরুষেরা সবাই সব কাজকর্ম বন্ধ ক'রে সন্ন্যাসী

হয়ে যেত !......কোনও বন্ধুর বাড়ীতে তাস খেলা হলে তো ও বাড়ীর মেয়েরাই জলখাবার, কফি ক'রে ওদের খেতে দেয়।'

'অভাগিনী ওরা, কিই বা করতে পারে? পুরুষের দাসী যে।'

'অভাগিনী ওরা নয়, তুমি। যাক্ গে, তোমার কপালই মন্দ তো আমি আর কি করতে পারি? বেশ তুমি শাড়ী না চাও তো আমি সানন্দে গরম স্যুট করিয়ে নেব।'

"মনে মনে 'ভগবান তোমায় অনেক প্রণাম' বলে আমি নিবৃত্তির নিশ্বাস ফেললাম। যদি জেদ ক'রে শাড়ী এনে আমাকে পরতে বাধ্য করেন তো, বারণ করার শক্তি আমার কোথায়? আমি চিঠি লিখতে বসে গেলাম।

'কি লিখছ?'

"ফস্ ক'রে বলে ফেললাম, 'গল্প'।

"উনি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি গল্প?'

"তাস খেলায় মত্ত স্বামীকে পাবার জন্য ব্যাকুল একটি নারীর দুঃখের কাহিনী।"

"কেন? ওকেও তাস খেলতে সঙ্গে নিয়ে যায় নি, এই জন্য? চুলোয় যাক্ তোমার ঠাট্টা, আর চুলোয় যাও তুমি। বাড়ী আসতে না আসতেই ঝগড়া শুরু। কে বলেছে তাস খেলা খারাপ? বলো, আমি তাকে বুঝিয়ে দি। আমি কি মদ খাই, না পরের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াই? তুমি কি বলতে চাও?"

'মাতাল, চোর, খুনী, বদমাইস সবাই তো নিজের ব্যবহারকে ঠিক মনে করে। ওদের দোষ দিয়ে ওদের আলোচনা করা তোমার পক্ষে—'বলতে বলতে আমার চোখের জল লুকোবার জন্য ওখান থেকে সরে গেলাম। তখনই শুনলাম উনি বলছেন, 'ডর্টী, রাস্কল! ঘুমোবার জন্য এদিকে এলাম আর উনি লাইট জেলে গল্প লিখতে বসলেন। কি আমার লেখিকা রে! বেচারার এতো প্রতিভা এখনও লোক চক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। এক কথার মাথায় চার কথা শোনাবে। বড় অহঙ্কার।'

"কথাটা ভাল লাগুক বা না লাগুক তবে এ ঠিক, হুকুম চালানোই যার অভ্যাস, সে কখনও স্ত্রীর চোপা সহ্য করবে না। যিনি নিজের পরিবারের দায়িত্ব নিয়েও তাকে সুখী রাখতে পারেন না, তিনি আবার ছদ্মবেশী বন্ধুদের জন্য সব কিছু দিতে প্রস্তুত। ঘরের তেল বাঁচাবার জন্য যে রাস্তার আলোয় কাজ চালায় সেই আবার নিজের ভোগ বিলাসের জন্য অজস্র টাকা খরচ ক'রে ফেলে। সে যা চাইবে তাই করবে। ওর ভাল মন্দ সব কাজকেই সখ মানতে হবে। ও যা বলবে সেটাই ধর্ম। যা করতে বারণ করবে তাই নিষিদ্ধ। এবার বল, আমার কিসের গরজে আমি অন্যের মন রেখে চলব?"

খুব মন দিয়ে সব কথা শুনছিলাম। আমি কখনও ভাবতে পারিনি যে ভানুর মনে তার বাড়ীর লোকেদের জন্য মমতা ছাড়া অন্য কোন রকমের ভাবনাও থাকতে পারে। কিন্তু তখন আমি কিছু বলতে পারলাম না। শুধু অবাক হয়ে গেলাম। ভানুর মনে পুরুষদের প্রতি এত ক্ষোভ, এত বিদ্বেষ?

আমি বললাম, "তোমার কথা বুঝেছি ভানু! কিন্তু আমার কথাটাও শোন। কিছুক্ষণের জন্য নিজের আশা-আকাঙ্খার কথা যদি ভুলে যেতে পার তো জামাইবাবুর অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবে। ছোট বেলার থেকেই উনি কারুর অধীনে থাকেন নি, কাউকে ভয়ও করেন নি, তাই বোধহয় নিজের ইচ্ছে মত ঘুরে বেড়ানর অভ্যাস হয়ে গেছে। এইজন্যই নিজের ইচ্ছেয় বাধা পড়লে সহ্য করতে পারেন না। একে অবিবেচকই বল বা জেদই বল, কথা একই। শুধু নিজের যা ভাল লাগে তাই করতে গেলে মানুষ কতরকম নেশায় পড়ে যেতে পারে তা তুমিও বুঝতে পারবে। তুমি···"

মাঝপথেই ভানু আমাকে থামিয়ে বলল, "বিয়ের আগে ওঁর বিষয় সব কথা তো তোমায় বলেছিলাম। তখন কি তুমি একথা বুঝতে পার নি? ছেলে বেলায় যাঁকে শাসন করা হয়নি তাঁর

কতরকম নেশা হতে পারে এ বিষয় যদি তুমি একটু আভাসও দিতে দাদা, তো…"

"কি পাগলামি করছো ভানু ? আজ ওঁর এমন ব্যবহার দেখেই না মনকে প্রবোধ দিচ্ছি ? কিন্তু যা হয়ে গেছে সে বিষয় ভেবে কি কোনও লাভ আছে ? পঁচিশ বছরের জীবনে যা হয়ে এসেছে, তারমধ্যে হঠাৎ পরিবর্তন আনা কি এতই সহজ ভানু ! নিজেকে আগে শান্ত ও সংযত না করলে ওঁকে বদলাতে পারবে কি করে ? আবেগে কোন কাজই হবে না।"

"তুমি কি মনে কর দাদা, পার্বনের দিনেও যাঁকে মিনতি ক'রে তাঁর স্ত্রী বাড়ীতে রাখতে পারল না তাঁর কত যুগের পর পরিবর্তন হতে পারে ? আমার ধৈর্য কি কোনও কাজে লাগবে ?"

"একটু সবুর কর ভানু ! জামাইবাবুর পক্ষ আমি নিচ্ছি না, কিন্তু তুমিই বল, ধৈর্য রাখা ছাড়া তোমার কি আর কোন উপায় আছে ? তাস খেলার নেশায় উনি সব কিছু ভুলে যাচ্ছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু তোমার উপর এমনি ওঁর কোনও রাগ আছে তা তো মনে হয় না। কি বলো ?"

ভানু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। "তুমি কিছুই জান না দাদা ! এখানে পড়তে আসছ বলে তুমি যে চিঠি দিয়েছিলে তা পেয়ে আমার খুব ভয় হয়েছিল। কেন জান ? আমার সুখ-দুঃখ সব তুমি জেনে ফেলবে তাই। কিন্তু আজ তোমাকে আমি আমার কথা বোঝাবো কি করে ? আমি যে দম বন্ধ হয়ে মরছি তুমি কি তা জান ? আমি আর কি বলব ? তোমাকে নিজেই বুঝতে হবে।"

আমি চুপ করে সব কথা শুনে যাচ্ছিলাম। কিছু বলবার ইচ্ছে হলো কিন্তু চেপে গেলাম। ভানু এমনিতেই ভাবুক। ওর স্বামীর চালচলন ওর ভাল লাগেনা। ওর সব আশা ভেঙ্গে গেছে, তাতে ওর কষ্ট পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমনিতে আমি এরকম অনেক লোক দেখেছি যাদের তাস খেলার নেশা জামাইবাবুর চেয়েও বেশী। তাই তাড়াতাড়ি আমার পক্ষে কিছু বলা ঠিক নয়। পাগলামি

করে হঠাৎ যদি কিছু করে বসে? আস্তে আস্তে আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলাম। যখন স্কুলে পড়তাম তখনকার সব কথা, সে সময়ের বন্ধুদের কথা বললাম। য়্যুনিভার্সিটির গল্প শোনাতে লাগলাম।

বারোটা বেজে গেল। বললাম, "ক্ষিধে পেয়েছে ভানু।"

ভানু চটপট উঠে পড়ল। "কথায় কথায় একেবারে ভুলে গেছি দাদা। চল খেতে চল।" টিফিন কেরিয়ার খুলে চুপচাপ খাবার ভাগ করতে লাগল।

লোকেরা প্রায়ই বলে, কখন যে কি হতে পরে তা বলা শক্ত। এখন এ কথাটা আমি বুঝতে পেরেছি। কোথায় বাগানে বট-গাছের ছায়ার পুকুরের ধারে বসে খাওয়ার কথা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত কি হচ্ছে।

"তুমি আছ বলেই আমিও খাচ্ছি দাদা। নয়তো সব জিনিষ অমনিই পড়ে থাকত।"

"এটা তোমার ভুল। এ ভাবে উপোস করা ও রাত জাগা কি ঠিক? তুমি খেয়েছ কি না এটুকু জিজ্ঞেস করবারও তো এখানে কেউ নেই। কিন্তু খেতে তো হবেই। অভিমান করে কি লাভ?"

"কি আর বলব দাদা! এ বাড়ীতে যা করতে চাই তা করতে পারব, যা রান্না করি তা খেতে পারব এরও কি কিছু ঠিক ঠিকানা আছে? এর কারণ শুধু উনি, একথা আমিও বলছি না। আমিও অনেক ভুল করে বসি। জলখাবার দিয়ে জল দিতে ভুলে যাই। কখনো কখনো চিনি না দিয়েই কফি খাইয়ে দি। ঘোল করে ওতে নুন দিতেই ভুলে যাই। এ সব আমার ভুলের দরুণই হয়। কিন্তু এর পরিণাম খুবই খারাপ হয়ে থাকে। উনি ভাবেন ওঁকে আমি গ্রাহ্য করি না, মন দিয়ে সেবা করি না। ওঁর জন্য আমার মনে একটুও ভক্তি থাকত তো আমি এ ভাবে কাজ করতাম না। আমি কোনও উত্তর দিই না।

"উনি বলেন, 'তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না। তুমি জেনে

শুনে কর কি ভুল করে কর এ জানবার আমার দরকারও নেই। যা কিছু আমি দেখছি ওটাই সত্যি। আমার উপর তোমার এতটুকু ভক্তি শ্রদ্ধা থাকত তো এরকম হত না।'

"আমি ভুল করি নিশ্চয়ই। কিন্তু উনি যা মনে করেন তা নয়। ওঁকে অগ্রাহ্য ক'রে অপমান করে আমি বিশেষ আনন্দ পাই না। যখন আমি চিনি না দিয়েই কফি দিই তখন যদি উনি বলতেন, 'ভানু, কফিতে চিনি দিতে ভুলে গেছ, একটু আন তো,' তাহলে কত ভাল লাগত। তা না বলে ঐটুকু ভুলের যা তা মানে লাগিয়ে ওঁর কি গৌরব বাড়ে? আমার এতবড় ভুল কখনও হয়নি যার জন্য আমাকে ক্ষমা করা যায় না, বা এ ভুল বোঝাবুঝি দূর করা যায় না। স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরকে বুঝে চলার ইচ্ছে হওয়াই উচিত। কিন্তু ওঁর মধ্যে এটা একেবারে নেই। কথায় কথায় রাগ, একটুতেই বাড়া ভাত ফেলে চলে যাওয়া। এসব তো ওঁর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

"ঝুড়ি ভাজা মিক্সচার[1] ইত্যাদি কোনো না কোনো জিনিস আমি সর্বদাই জলখাবারের জন্য তৈরী করে রাখি। উনি জানেন, তবুও আশা করেন আমিই বার বার ওঁকে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করবো। নিজে চেয়ে উনি খেতে চান না। সব কাজ ওঁর মেজাজ দেখে করতে হবে। আমি বলি, যখন যা খেতে ইচ্ছে করে তুমি চেয়ে নেবে, আমি এনে দেব। বাইরের অতিথির মত নিজের খাতির আমাকে দিয়ে কত দিন করাবে?' তার উত্তরে উনি বলেন, 'অতিথিদের খাতির তুমি করতে পার, কিন্তু নিজের ঘরের লোকের পার না! তুমি আমাকে যদি সত্যিই চাও তো এসব নিশ্চয়ই করবে। তুমি আমার স্ত্রী, তার দায়িত্ববোধ থাকা চাই তোমার।'

"কোনও কোনও লোকের প্রবৃত্তিই এরকম। উনি চান অন্য লোকেরা সর্ব্বদা ওঁর সেবা করবে আর উনি হাত পা গুটিয়ে বসে

---

[1] চিড়ে, চিনেবাদাম সব মিলিয়ে এক ধরণের জিনিষ।

থাকবেন। শুধু তাই নয়, যারা সেবা করবে উনি তাদের সমালোচনা করবেন। কতদিন লোকে এসব সহ্য করতে পারে? আমি মন দিয়েই সব কাজ করি। তবুও উনি বলেন, ঘরকন্নার দায়িত্বজ্ঞান আমার এখনও হয় নি। কফির কাপ হাত থেকে পড়ে গেলে বা আয়না পড়ে ভেঙ্গে গেলে আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। জেনেশুনে তো আর কোনও জিনিষ ভাঙ্গছি না, ভুলের জন্যই ক্বচিৎ কখনও কোনও জিনিষ ভেঙ্গে যায়। তার জন্য আর ভেবে কি লাভ? ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে কাজ করব এই মনে রাখাই যথেষ্ট। কিন্তু ওঁর মতে এটা মারাত্মক অপরাধ। বলেন, "দেখ, সব মেয়েরাই নিজের বাড়ী কত ভাল ক'রে রাখছে। ঘরের খরচা থেকে বাঁচিয়ে নতুন নতুন জিনিস কিনছে। তোমার মধ্যে গৃহিণীর এ সব গুণ নেই। তোমার চলার পথে যেসব জিনিস রয়েছে, সেগুলো পড়লো কি ভাঙ্গল কিছুই গ্রাহ্য না করে পুরুষের মত সগর্ব্বে এদিক ওদিক ঘোর। সাবধানে চলাফেরা করলে কি আর কাপ পড়ে যায়? ছেলেটার কাছে আয়না রাখবার কি দরকার ছিল? এ সব তুমি আর কবে শিখবে?'

"বাস, এরকমই চলে যাচ্ছে। আমি বুঝতে পারি না ওঁকে কি বলি। শুধু ভাবি কারুর বাড়ীতে কি 'কাপ' কখনও পড়ে যায় না? ছোট ছেলে জিনিস ভাঙ্গে না? এরকম কি শুধু আমিই করি? ছোট্ট একটা 'কাপ' ভেঙ্গে গেল তো হল কি? এ নিয়ে এতক্ষণ ধরে উপদেশ দেওয়ার কি দরকার? কখন আবার কি ভুল হয়ে যাবে তার জন্য সব সময় কি তটস্থ থাকতে হবে? কখন কোন ছুতোয় ঝগড়া বাধিয়ে বসবেন, তারপর যা-তা গালাগাল দেবেন, আর আমি একা ছটফট ক'রে মরব। কখনও বলেন, 'চিনিতে পিঁপড়ে ধরেছে।' কখনও 'নুনের কৌটোর ঢাকনা খোলা।' আর কখনও বা 'আচার রোদে দেওয়া হয় নি কেন?' শেষ পর্যন্ত রেগে মেগে বলেন, 'এ সবও তোমাকে রোজ রোজ বলতে হবে। কোথায় খেয়ে দেয়ে আরামে ঘুমবো,

না। সর্বক্ষণ তোমার পেছনে পড়ে থাকতে হবে। তোমাকে বিয়ে করাই আমার দুর্ভাগ্য। যা করেছি তার ফল আমাকেই ভুগতে হবে।' রোজ রোজ এরকম কথা কোন স্ত্রী সহ্য করতে পারে? রান্নাঘরে গিয়ে চেয়ে জল খেতে যার পৌরুষে বাধে, সে মেয়ে মানুষের ছোট ছোট কথায় মাথা গলিয়ে গালি কি করে দেয় সেটাই আমি ভেবে পাইনা। এসব কথা যদি সবসময় ভাবি আমি পাগল হয়ে যাব, দাদা।" বলে ভাত ডাল মেখে ভানু খেতে লাগল।

আমি সব শুনলাম। ভানুর কথা আমি বুঝতে পেরেছি। তবুও বললাম, "দেখ ভানু! এরকম ভাবনাচিন্তা কেন করো? জামাইবাবুর মেজাজ বুঝে চল, তো ঝগড়া কোত্থেকে হবে?"

তক্ষুণি মাথা তুলে ভানু গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চাইল।

বললাম, "রাগ করলে নাকি?"

ও মাথা নেড়ে বলল, "না, আমি শুধু একটা কথা ভাবি, কোনো পুরুষই স্ত্রীর মন ঠিক ঠিক বুঝতে পারে কি না?"

"বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। তার কারণ হল ও যে পুরুষমানুষ।"

"বিলক্ষণ। তৃণের চেয়েও ক্ষুদ্র আর তুলোর চেয়েও হাল্কা যে স্ত্রী, তার মন বলে কি কোনও পদার্থ আছে, যাকে বোঝা দরকার? কি বলো?"

"ভানু! তুমি একটি আস্ত পাগল, কত ভুল ধারণা তোমার। তোমার যা অনুভূতি অন্যের তা নয়। তোমার সিদ্ধান্ত তো অপরের সিদ্ধান্ত হতে পারে না।"

"ভুলধারণা আমার নেই। স্ত্রী কোনো ঠিক কথা বললেও কেউ গ্রাহ্য করে না। পুরুষমানুষ সব কিছু করতে পারে, তাকে বাধা দেবার কেউ নেই। তার স্বাধীনতা সর্বদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। আমি যদি একটু বেশী কথা বলি, তো লোকে আমাকে বাচাল বলবে। তাহলে, তুমিও কি তাই বলবে?"

"কেন? আমি কি পুরুষ নই?"

"হতে পারো। কিন্তু তুমি একেবারে অন্যরকম। যারা তোমার উপর নির্ভর করে তাদের প্রতি তুমি কখনও অন্যায় করবে না, যে তোমায় ভালবাসে তাকে তুমি কখনও ঘেন্না করতে পার না, যে তোমায় চায় তাকে তুমি ঠেলে দেবে না।"

"এ ধারণা তো ভুলও হতে পারে? সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকেও কি রকম বদলে যায়, তা কেউ জানেনা। কালকে আমার স্ত্রীও যদি এইসব বলে, আর তার মনেও যদি এ বিশ্বাস থাকে, তাহলেই বুঝবো তুমি যা ভাবছ আমি তাই।"

"তা নিশ্চয়ই হবে। সময় সবাইকেই বদলাতে পারে না। জেনে রেখো এমন লোকও আছে যারা সময়ের বন্ধনের বাইরে।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হলো। এমনিতে আমি বেশ সহজভাবেই ভানুর সঙ্গে কথা বলছিলাম কিন্তু মন আমার হাহাকার করছিল। বিট্টু তখনই ঘুম থেকে উঠলো। ওকে কোলে নিয়ে নতুন নতুন কথা শেখাতে লাগলাম।

"বিট্টু, আজ তোমায় গুণতে শেখাবো, শিখবে?"

তখন ওর ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছিল, মাথা নেড়ে দিল।

"তাহলে আমি যেরকম বলছি সেরকম বল,—এক।"

"য়াক্।"

"আবার ঐ বলছ, য়াক বলো না।"

"আমি তো ঐ রকমই বলবো।"

"ওরকম বল তো মারও ঐ রকম খাবে।"

"কেন মারবে?"

থাম্ ছোঁড়া। যে রকম বলছি সেরকম বল্। এতটুকু ছেলেটা আমার মুখের উপর কথা বলতে আরম্ভ করেছে।"

"আমাকে গাল দিচ্ছ কেন?"

আমার আশ্চর্য লাগল। ওর দিকে চেয়ে রইলাম। এর মধ্যে

ভানু কোত্থেকে এসে গালে হাত দিয়ে কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "দেখছ, আমার ছেলেকে ?"

"সত্যিই, এ তোমারই ছেলে বটে।" আমার কথা শুনতেই ভানু ওকে চুমু খেয়ে খেয়ে অস্থির ক'রে তুলল।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "ভানু! তোমার ছেলে ডাক্তার হবে, না অভিনেতা, না উকীল ? ওকে কি করতে চাও, বলো না ?"

"একবার স্বপ্ন দেখবার ফল তো পেয়েছি, আবার ঐ একই ভুল করি এটাই কি তুমি চাও ? এখন আর সেরকম কোনো আশাও নেই, শক্তিও নেই। পেটভরে খেতে পাই, পরতে কাপড় পাই, আর মান বজায় রাখতে পারি এই যথেষ্ঠ।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও আমার কাছে বসে পড়ল। আমি তক্ষুণি দমে গেলাম, মর্মাহতও হলাম।

"এত নিরাশ হবার কি আছে ভানু ?...যতদিন আমি আছি তোমার ও তোমার ছেলের কোনও অভাব হবে না।...আমায় দেবে তোমার ছেলেকে ? ওকে খুব বড় ডাক্তার ক'রে তোমাকে ফিরিয়ে দেবো।"

"নিয়ে যাও। ওর বাপের বোঝা হালকা হবে। তারপর যা বাকী রইল তা কম হবার তো আশা নেই।"

আমি সত্যিই রেগে গেলাম। "কতবার বলেছি ভানু, এসব কথা বোলো না। প্রত্যেক জিনিসকে তুমি এত বেশী বাড়াও কেন ? নিজের ছেলেকে বোঝা ভাবতে পারে এমনও কি কোনও বাপ আছে ? তুমি বললেই কি কেউ একথা বিশ্বাস করবে ? এভাবে অন্যকে সবসময় ছোট ভাবা কি ঠিক ?"

ভানু এক মুহূর্তের জন্য আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, "তুমি ঠিকই বলছো। যার মন সরল সে বিশ্বাসই করতে পারে না কেউ খারাপ। এ জগতে সবাই তোমার মত স্নেহশীল নয়। যার মধ্যে প্রেম থাকে সে মা, বাপ, স্ত্রী, পুত্র সবাইকে ভালবাসে। আচ্ছা

বলতো, ছেলে কোলে নিয়ে ওঁকে তুমি কখনও বেড়াতে দেখেছ ? রাস্তার লোকেও ওকে দেখলে আদর করে। অন্ততঃ এতটুকু ভালবাসাও তো বাপের থাকা দরকার, কি না ?''

''কথা তো ঠিকই বলছ, কিন্তু এত সামান্য কথা...''

''না দাদা, বাপ যে নিজের ছেলেকে আদর করে নিজের কাছে ডাকে না, সেটা সামান্য কথা ? আমি তো একে হেসে উড়িয়ে দিতে পারি না। সকালে ঘুম ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই ছেলের উপর চটে যান। আমি তো পাঁচটার সময় উঠেই কাজে লেগে যাই। কখনও, কখনও সে উঠেই সোজা আমার কাছে চলে আসে, নয় তো ওখানেই বসে বসে কাঁদতে থাকে। তাতে মশাই-এর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বলেন, 'দূর, হারামজাদা কোথাকার! সকাল থেকেই কান্না। সব মায়েরই লক্ষণ।' বলে ওর হাত ধরে টেনে, ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দেন। আটটা পর্যন্ত দরজা বন্ধই থাকে। ভয়ের চোটে ও কাঁদতে থাকে আর আমি রাগে জ্বলে মরি। সব কাজ কর্ম ফেলে ওর কাছে বসে পড়ি। চোখের জল বাধা মানে না। ছোট ছেলেরা বাপের বুকে ঘুমিয়ে থাকে তাই তো জানি। কিন্তু এ অভাগার ভাগ্যে তাও জুটলো না। তাই কখনো কখনো আমি উঠেই ওকেও কোলে তুলে আনি। রান্নাঘরের সামনে মাদুর পেতে শুইয়ে দিই। ছোট ছেলের কান্না যাঁর সহ্য হয় না, তিনি আবার মাঝ-রাত পর্যন্ত জেগে জেগে তাস খেলেন। ওঁকে খোলাখুলি বল বা না বল, ওঁর মনে এসব লাগেই না। ওঁর খাবার সময় বা কফির সময় কাছে পিঠে কোথাও বিট্টুর থাকা বারণ। কি জানি ও কি করে বসবে। তাই উনি খেয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত ওকে বাইরে কোথাও রাখতে হবে। কিন্তু খেতে দেবার জন্য আমাকে তো ওঁর কাছেই থাকতে হয়, কখনো ও যদি আমার পেছনে পেছনে চলে আসে তো উনি রেগে আগুন হয়ে বলেন, 'হারামজাদার পাও ভাঙ্গে না! এটা খোঁড়া হয়ে গেলেই ছিল ভালো।'

"আমাকে যা খুশি তাই বলতে পারেন, কিন্তু ওকে এভাবে গালাগাল দিলে আমি সহ্য করবো না। তখন কিছু বললেই উনি সব ছেড়ে ছুড়ে উঠে যাবেন, সেটা খুব ভাল করেই জানতাম, কিন্তু তবুও আমি চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না—'বখাটে ছেলেদের মত শুধু ঘুরে বেড়ানোর জন্য পায়ের দরকার না হলেও নিজের পেট চালাবার জন্য তো দরকার হবে? ওর বোঝা তো তোমাকে বইতে হবে না? ওকে এরকম শাপ শাপান্ত করবে না।'

'যদি করি তো করবে কি?'

'কিছুই করবো না। তোমার কাছে শুধু বলতে চাই, এরকম কথা বলা উচিত নয়।'

'ওঃ, আজ উনি এসেছেন আমায় উপদেশ দিতে। তুমি যা বলবে তাই করবো, সেটা এ জন্মে সম্ভব নয়, জেনে রেখো।'

"কখনো তো এমন কাণ্ডও ঘটে যা আমার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে।"

"জামাইবাবু এরকম বোকা বোকা কথা বলেন?"

"আচ্ছা, বিশ্বাস করতে পারো, বা না পারো, আমার কথাটা শোন তো! উনি যতক্ষণ বাড়ী থাকবেন, ছেলে কাঁদতে পারবে না, চেঁচাতে পারবে না, নিজের খেলনাও এদিকে ওদিকে ফেলতে পারবে না। ওকে ঘুমোতে হবে, বা চুপচাপ বসে থাকতে হবে। আর যদি খেল তো নিঃশব্দে খেলতে হবে, যাতে বাড়ীর শান্তি ভঙ্গ না হয়। ওঁর এই আদেশ। এর বদলে ও যদি চেঁচামেচি ক'রে খেলতে থাকে, ক্ষিধে পেলে খেতে চায়, কোনও জিনিষের জন্য বায়না ধরে, ঘুম পেলে বিরক্ত করতে আরম্ভ ক'রে তো সব দোষ আমার। আমি ছাড়া এত বড় জগতে যেন কেউই ছেলের মা হয় নি। বোধহয় ওকে আমি আদরে বাঁদর বানাচ্ছি। ওকে বার বার কাঁদতে আমিই শিখিয়েছি। ওকে শাসন করতে পারছি না। বলো, এটাও কোনো কাজের কথা?" আমার গা শিউরে উঠল।

“থেমো না, বলে যাও।”

“একবার ওর শরীরটা কিছু খারাপ হয়েছিল। হজমের গোলমালে পেটের অসুখ। দু’তিন দিন এ ওষুধ সে ওষুধ দিয়ে কোনো ফল হল না, বরং আরও দুর্ব্বল হয়ে গেল। তখন ভয় পেয়ে আমি ওঁকে বললাম, ‘বিট্টুকে ডাক্তার দেখাও।’ তার কি উত্তর দিলেন, জানো? ‘একটু হেঁচেছে অমনি ডাক্তার চাই, ডাক্তারকে পয়সা না দিলে তোমার ঘুম হচ্ছে না। পাশের বাড়ীর মাসীমাকে জিজ্ঞেস ক’রে আদার রস টস কিছু খাইয়ে দেখ না। আমার অফিস যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। যদি বাড়াবাড়ি হয় তো কাল দেখা যাবে।’ শুনতেই আমি জ্বলে উঠলাম।

‘দু’দিন ধরে এরকম জিনিষই তো খাওয়াচ্ছি, তাতে কিছুই হচ্ছে না। দুর্বলতার জন্য চোখ খুলতেও পারছে না। আরও বাড়াবাড়ির কি মানে? আরও কি হতে হবে?’

‘ছিঃ, প্রত্যেক কথায় তোমার তর্ক। দু’দিন ধরে যখন এমন চলছে আজও আর কিছু হবে না। সন্ধ্যে বেলা দেখা যাবে।’

‘দেখবেন, ওর মরা মুখ দেখবেন। সেটী হচ্ছে না। আমি তা হতে দেব না। আপ্রাণ চেষ্টা ক’রে ওকে ঠিক করে তুলব।’ তক্ষুণি রিক্সা ডেকে ওকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমার আঙটীটা কম দামে এক জায়গায় বিক্রী ক’রে ডাক্তারের কাছে গেলাম। ইঞ্জেকশন লাগিয়ে, ওষুধ খাইয়ে উনি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমার গর্ব হল বিট্টুর মা তো আছে। পরে এ নিয়ে অনেক বকাবকি হয়েছিল। সে আলাদা কথা। ওঁর বক্তব্য ছিল যে, আমি বাড়ী ছেড়ে বাইরে গিয়ে ওঁর অপমান করেছি। এবার বল, প্রত্যেক বাপই নিজের ছেলেকে ভালবাসে?’

“কি আর বলবো? এসব শুনে কি কেউ বিশ্বাস করতে পারবে? যে নিজের ছেলেকে বুকে টেনে নিতে পারে না সে আবার বাপ

কেমন ? ছোট ছেলেপিলের আমেদ-আহ্লাদে যার আনন্দ হয় না, সে কি মানুষ ? যদি এতই নিভৃতে থাকার সখ তো বিয়ে করতে গিয়েছিলেন কেন ? এক বছরের ছেলেকে যে শাসন করতে চায় সে নিজে কেন চব্বিশঘণ্টা বাইরে বাইরে কাটায় ? পয়সার জন্য যে ছেলের চিকিৎসা করাতে চায় না, এ ভাবে পয়সা নষ্ট করে কি করে ? এ সমস্ত আজে বাজে কথার কি কোনও মানে হয় ? ছোটবেলা থেকেই উনি মাতৃপিতৃহীন বলেই কি শিশুদের ঘেন্না করবেন ? বরং এরজন্য তো আরও বেশী মায়া হওয়াই স্বাভাবিক। এ লোকটা তাহলে ভালবাসে কাকে ?”

“কি দাদা, কথা বলছ না যে বড়।”

“কি আর বলব ভানু ! তুমি মা, তুমিই সব ঠিক ক’রে নেবে, এই ভেবেই উনি এসব কথায় মাথা ঘামান না বোধহয়। নয় তো নিজের ছেলেকে কি কেউ ঘেন্না করতে পারে ? তুমিই বলো ?”

ভানু রেগে গেল। “বিয়ে করে যখন সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন তখন তো ওঁর কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার। তুমিও কি সেই রকম কথা বলবে ?” একটু থেমে আবার বলল, “যদি শারদা আমার মত অবস্থায় পড়ত, তাহলেও কি তুমি এত নিশ্চিন্ত থাকতে দাদা ?”

“বেশ ! এতোদিন ধরে আমি ভাবতাম আমার একটি ভাই আছে যার কাছে আমি মন খুলে সব বলতে পারি, তাকেই আমার সুখ-দুঃখের কথা শুনিয়ে মন হাল্কা করব। এই আশাতেই আমি বেঁচে আছি। আমার দুঃখ তুমি বুঝেছ, অন্ততঃ এ কথাও যদি বলতে তো কিছু সান্ত্বনা পেতাম। এখন আমার এ সংসারে কেউ নেই, কেউ নেই।”

ভানু হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল। তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। চোখে জল এসে গেল। ভানুর হাত আমি সজোরে চেপে ধরলাম।

“ভানু ! বোনটি আমার, তুমি আমাকে একেবারে ভুল বুঝেছ।”

ভানু মাথা তুলে আমার দিকে চাইল।

"কোনও অশান্তি তোমায় অস্থির করে তুলেছে, এ কথাটা অনেক আগেই আমার মনে হয়েছে। কিন্তু তোমায় জিজ্ঞাসা করবার সাহস হয়নি। তোমার সব কথা শুনে আমার মন কত উদ্বিগ্ন হয়েছে তা কি বলবো? তোমার চোখে জল দেখে আমার মনে কি হচ্ছে সে কি বুঝছ? তোমার ব্যথা আমি বুঝি না তুমি এই ভাব? কিন্তু আমার মনে যা কিছু হচ্ছে সে সব বলে তোমায় আরও অস্থির ক'রে কি লাভ? তোমার মন নরম ভানু! এ সব শুনে স্বামীর উপর যদি আরও বিরক্তি এসে যায়—ভাঙ্গা কাঁচ কখনো জোড়া লাগে না। যাতে তুমি অস্থির হয়ে পড়, সে কাজ আমি কি ক'রে করবো? আমার এতোদিনের ভালবাসাকে কত তুচ্ছ ক'রে দিলে ভানু!"

"দাদা!" বলে ভানু সজল নয়নে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েই রইল।

"ভানু! শারদা আমার নিজের বোন বটে, কিন্তু ওর কোনো কাজেই আমি লাগি না। ওর পছন্দ মত গয়না, কাপড় সব মা বাবা দেন। শারদার মন তোমার মত এতো কোমলও নয়। এরকম লোকে সহজে দুঃখকে আমল দেয় না। ভাই হিসাবে আমি কারুর কাজে লাগতে পারি তো সে শুধু তোমারই।"

"আমাকে ক্ষমা করো দাদা! দুঃখের আবেগেই আমি ধরে নিয়েছিলাম আমার কেউ নেই। কিন্তু তা নয়। তুমিই তো বল, আমি ভাবুক বেশী। তুমিই আমার সহায়। তুমি ছাড়া আমায় কেউ ভালবাসে না" বলে আমার চোখ মুছিয়ে দিল।

ভানুর ঐ হাতটা ধরে বললাম, "ভুল করছো! জামাইবাবুর পরেই আমার স্থান। কাউকেই এত শীগ্‌গির বাতিল করা ঠিক নয়। তোমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ সব দেখার ভার জামাইবাবুর।"

ভানু ব্যর্থতার হাসি হাসল, "আমার ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ! এ জীবনে আর হবে না দাদা।"

আমি কিছু বললাম না।

একটু পরে ভানু বলল, "আমার একঘেয়ে কথা শুনতে তোমার আর ভালো লাগছে না বোধহয়।"

আরও শুনতে আমি উৎসুক, এরকম ভাবই দেখালাম। তবে মনে খুবই ভয় হচ্ছিল, আবার কি না কি শুনতে হবে।

"বিট্টু হবার আগে একবার আমার জ্বর হয়েছিল। রাত্তিরে উনি যখন বাড়ী ফিরলেন তখন আমি বিছানায় শুয়ে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুয়ে যে?'

"জ্বর জ্বর লাগছে। মাথাও ধরেছে।"

"আজ রাতে কিছু খেওনা। কাল ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমার গায়ে হাত দিয়েও দেখলেন না। ঠাণ্ডা লাগছিল বলে আমি চাদর ঢেকে নিলাম।"

"রাতে ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম উনি বিছানায় নেই, আলো জ্বলছে। বাইরের দরজা ভেজান ছিল। অবশ্য এটা কোনও নূতন ব্যাপার নয়। কিন্তু তবুও ভয়ে কেঁপে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দরজা বন্ধ ক'রে আসতে আসতেই মনে হল যেন হাতে পায়ে কোনও বল নেই। সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটে গেল। খুব তেষ্টা পেয়েছিল। তাই ঠাণ্ডা জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম এলো না। প্রায় বারোটার সময় ওঁর আওয়াজ পেয়ে দরজা খুললাম। 'ভেবেছিলাম এক্ষুণি এসে যাবো কিন্তু দেরী হয়ে গেল। জ্বরটা এখন কেমন ভানু।' বলে উনি আমার বিছানায় বসে পড়লেন।"

'সেরকমই।'

'চিন্তার কিছু নেই। কাল সকালের মধ্যে জ্বর সেরে যাবে।'

"জ্বর যদি নাও সারে, তো কার কি? আমাকে সান্ত্বনা দিতে কে বাধ্য করেছিল ওঁকে? সকাল হতেই জ্বর আরও বেড়ে গেল। উনি কিছু জানতে পারলেন না।"

'রান্না করতে পারবে না?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি হোটেলে খেয়ে নেব। তোমার কিছু চাই ?'

'কিছু চাই না।'

'বেশ !'

"উনি কি জানেন না জ্বর কম না হলে ডাক্তার দেখাতে হয়, আর যে অসুস্থ তাকে অন্ততঃ পাউরুটী, কফি কিছু খেতে দিতে হয় ? আমার চোখে জল উপ্‌ছে এলো। লোকে বলে, যে অন্তঃসত্ত্বা তাকে কখনও উপোস করতে নেই। পেটের ছেলেটীর জন্যই কিছু না কিছু খেতে হয়। কিই বা খাবো ? কে খাওয়াবে ? দশটা পর্যন্ত অমনিই পড়ে রইলাম। এমন সময় বাইরে সোডা-ওয়ালার হাঁক শুনলাম। ঘরে এসে আলমারী, প্যাণ্টের পকেট, বাক্স, টানা সব খুঁজে একটা অচল পয়সাও পেলাম না। ভরা পোয়াতির এক বোতল সোডা খাওয়ার দুটো পয়সাও জোটে না। বল, আমার স্বামীর রোজগারে আমার কি লাভ হচ্ছে ? বাড়ীর গিন্নী হয়েও থাকার কোনও স্বাধীনতা নেই। চোখ মুছে বাইরে গিয়ে সোডাওয়ালাকে বললাম, পয়সা খুঁজে পেলাম না ভাই। শুধু শুধু তোমায় কষ্ট দিলাম'।

'তাতে কি দিদি, কাল নিয়ে নেব পয়সা'

'না ভাই, তা হয়না।' বলে আমি ভেতরে ঢুকলাম। কান্না চাপতে আমি চেষ্টাও করি নি। খুব কেঁদে নেওয়ার পর মন কিছুটা হালকা হল। সোডাওয়ালার আওয়াজ অনেকক্ষণ পর্যন্ত বাইরে শুনতে পাচ্ছিলাম। আবার বাইরে গিয়ে ওকে ডাকলাম। বললাম, 'পয়সাতো কালও দিতে পারব না ভাই। আমার জ্বর হয়েছে, কাল থেকে কিছু খাইনি, তেষ্টা পেয়েছে। এক বোতল সোডা...বিনা পয়সায় দেবে ?'

"ও আশ্চর্য হয়ে গেল।"

'সত্যি বলছি, আমি সোডা খেতে চাই। যখন পয়সা পাবো তোমায় নিশ্চয়ই দিয়ে দেব। এক বোতল সোডা পেতে পারি ?'

"ও যেন সম্বিত ফিরে পেল। 'নিশ্চয়, নিশ্চয়, পাবেন দিদি,' বলে সোডা আনবার জন্য ঠেলাগাড়ীর দিকে ছুটল। তার দেওয়া সেদিনের সোডা আমার অমৃতের মত লাগল। তার সে সহানুভূতি এ জীবনে আমি আর কখনও ভুলতে পারব না। খালি বোতল ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'আমার পেটে যে আছে সে যেন তোমার মতই ভালমানুষ হয়।' একটু হেসে সে চলে গেল। লোকে বলে, যার বল নাই তার ভগবান। সেই সোডা আমার ওষুধের কাজ করল। সন্ধ্যের মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল। আমি রান্না করলাম।"

বলতে বলতে ভানু থেমে গেল। আমি ওর দিকে দেখতে দেখতে এক মনে সব কথা শুনছিলাম।

"জামাই বাবু তোমায় কখনও টাকা দেন না?"

"কেন? সে কি এতক্ষণেও বুঝতে পার নি?"

"কিন্তু কখনও তুমি চেয়ে দেখেছ?"

"অনেকবার। আমি কয়েকবার ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, আমারও খরচ আছে, বার বার টাকা চাওয়া আমার ভালো লাগে না। তাই মাঝে মাঝে আমায় কিছু দিও। দরকার পড়লে, লজ্জা ছেড়ে চেয়েও দেখেছি। কখনও এক আনা দিলেও তার পূরো হিসাব চাই। এ আমার একটুও ভাল লাগে না। তাই, আর চাইও না। বাপের বাড়ী গেলে মা আমায় পাঁচ দশ টাকা দেন। হিসাব করে ওতেই কাজ চালিয়ে নি। যত কম খরচই করি না কেন পয়সা কমই পড়ে যায়, বাড়ে না কখনও। ওঁর রোজগার। তাই সংসার খরচের ব্যাপারে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। নিজের ইচ্ছামত আমি কোনও জিনিস কিনতে পারব না। একবার ফেরিওয়ালা এসেছিল। ওর কাছে রকমারি ফ্যান্সি জিনিস ছিল। আশেপাশের সবাই জিনিস দেখতে ভীড় করে দাঁড়াল। আমিও গিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম। সবাই নিজের নিজের পছন্দ মত জিনিস কিনছিল। পাশের বাড়ীর মাসীমার অনুরোধে আমি কিছু কিনতে বাধ্য হলাম। একটা ধূপদান আমিও

কিনলাম। চিনেমাটীর তৈরী, দেখতে গাছের মত, ভারী সুন্দর লাগছিল। নীচের দিকে বেশ ছড়ান, ওপরের ডালে ফুল, যাদের মধ্যে ধূপকাঠি রাখবার গর্ত ছিল। ওতে ধূপকাঠি লাগালে খুব সুন্দর দেখায়। মাসীমার থেকে একটা টাকা ধার নিয়ে ওটা কিনেছিলাম। এত সখ ক'রে কেনা জিনিসটা ওঁকে দেখাতেই বললেন, কাকে জিজ্ঞেস ক'রে কিনেছ এটা? বাড়ীর জন্য আমি একটা নিজের পছন্দমত জিনিস কিনতে পারি না? এই সামান্য ব্যাপারেও বাড়ীর গিন্নী হওয়া সত্ত্বেও আমার কোনও অধিকার নেই? কিন্তু যেহেতু ওঁর অনুমতি না নিয়ে জিনিসটা কিনেছি তাই এর দামও উনি দেবেন না। এই হল বিচার। বল, তখন আমি কি করতে পারি? মাসীমাকে ওটা ফেরত দেবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ওঁর বৌয়ের রূপোর একটা ধূপদান আছে শুনলাম। আর কারুকে গছানোও ভাল দেখাল না। ধিক্কার এলো মনে। হঠাৎ একটা উপায় মাথায় এলো। তক্ষুণি চাল দিয়ে ধার শোধ ক'রে দিলাম।

"পরে উনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'ওঁর টাকা দিয়েছ?'

'হ্যাঁ, দিয়েছি। আমার কাছে ছিল। আগে ভেবেছিলাম তুমি দেবে তাই বলেছিলাম।'

"জয়ীর গর্বে গর্বিত হয়ে হেসে বললেন, সংসারের দায়িত্ব তুমি নিতে চাও, না?'

"হ্যাঁ চাই। শুধু টাকা খরচের ব্যাপারে আমায় অধিকার দাও।'

"যাক্ গে, দায়িত্ব-অধিকারের কথা বাদ দাও। উনি ১৫০ টাকা মাইনে পান। মাসে অন্ততঃ দশ টাকাও যদি না বাঁচাতে পারেন তাহলে পরে খরচ কি ক'রে কুলোবে? বিয়ের সময়ে কেনা কাপড় পরেই এতদিন কাটছে। পরে খরচ বাড়বে বই কমবে না। এখন থেকেই যদি ধার নেওয়া শুরু হয়ে যায় তো ছেলের পড়াশোনার ব্যবস্থা কি করে হবে? কয়েকবার এরকম ক'রে ওঁকে বোঝাবার

চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোনও লাভ হয় নি। টাকা পয়সার ব্যাপার উনি আমায় কিছু বলেন না। কত আসছে, কত খরচ হচ্ছে, না ধার হচ্ছে বা কিছু বাঁচাচ্ছেন কিনা, আমি কিছু জানিনা। আমি জরির শাড়ী পড়তে চাই কিন্তু সে আমাদের সামর্থে কুলোবে কিনা জানি না। আমি বুঝে উঠতে পারছি না আমার ইচ্ছার দৌড় কতদূর হতে পারে। বলেন, 'টাকার ব্যাপারে তোমায় মাথা গলাতে হবে না। তোমার থেকে যখন এক পয়সাও পাওয়া যাচ্ছে না, তুমি রোজগারও করছ না, তো পয়সা কম, বেশীতে তোমার কি আসে যায়? এ সব ভার আমার। তুমি নিশ্চিত হয়ে বসো।'

"আমি কত নিশ্চিন্ত আছি, দেখছ, তো! টাকা পয়সার কথা না ভেবে আমি কি নিশ্চিত থাকতে পারি? সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা কিসের উপর নির্ভর করে—একজন অপরকে বুঝবে, অপরের সুখ-দুঃখ নিজের ক'রে নেবে, তাই না? কিন্তু আমাদের বাড়ীতে সে সম্ভব নয়। আসলে উনি ভয় পান যে, আমাকে এ সব কথা বললে আমি প্রতিবাদ করে প্রত্যেক জিনিসে ওঁর দোষ দেখাব। সেইজন্যই এসব বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে হবে।

"দেখ না, বাপের বাড়ী গেলে কত জিনিষ পাই। কিন্তু আমি শুধু নিয়েই যাচ্ছি, তার বদলে কিছুই দিতে পারছি না। দিদির ছেলেমেয়েগুলোকে কিছু দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু আমার কাছে টাকা কোথায়?

"একবার ওঁর সঙ্গে বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম। যতদিন উনি ওখানে ছিলেন নিজের উপর নিজের ইচ্ছে মত যা খুশি তাই খরচ করে সব টাকা শেষ করলেন। ফেরবার জন্য রেলভাড়া পর্যন্ত বাঁচল না। তখন আমার হাতেও কিছু ছিলনা। মার কাছে ওঁর রেলভাড়া কি করে চাইবো? বিয়ে হয়ে যাবার পরও আর কতদিন মার থেকে টাকা চেয়েই যাবো? তাই কারুর কাছে হাত পাততে

আমার বাধলো। আমার মঙ্গল সূত্রে 'বরলক্ষ্মী'র একটি 'ব্রত-প্রতিমা' ছিল, সেটাই আমি দিয়ে দিলাম। বলে দিলাম কোথাও হারিয়ে গেছে। কিন্তু সংসারে এমন অবস্থা আসেই বা কেন? এত ছোট খাটো জিনিষেও স্ত্রীর কাছে নিলর্জ্জ হয়ে টাকা চাইবার দরকার পড়ে কেন? তখন তার পুরুষত্ব কোথায় উঠে যায়? এ সংসারের কথা কি শেষ হবার? তোমাকে কত বলতে পারি, কিন্তু তুমি বসে বসে কতক্ষণ শুনবে সব?" বলে হেসে ভানু চটপট কথাটা ঘুরিয়ে নিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "থেম না ভানু। শুনিয়ে যাও সব। আমাকে তোমার দুঃখের কথা সব শোনাও। তোমায় কোনও সাহায্য না করতে পারলেও অন্ততঃ তোমার দুঃখের সঙ্গী তো হতে পারব? এতদূর যখন বলেছ, আর কিছু লুকিও না, এখন আমাকে সব বলো।"

"ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার খুব ভয় করছে দাদা! প্রত্যেক স্ত্রী, স্বামীর ভালবাসা পেতে চায়। কিন্তু তা আমার ভাগ্যে নেই। আমাকে উনি একটুও ভালবাসেন না। বিট্টু হবার আগে ঝি রাখতে আপত্তি ক'রে বলেছিলেন, 'উঃ, মহারাণীর অন্দর মহলে একটি দাসী না থাকলে কি আর চলে? ডাক্তারে কি পরামর্শ এ সময় দেন জান না? ছেলেপিলে হবার আগে পর্যন্ত যে সব কাজ নিজের হাতে করে তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে। খেয়ে দেয়ে আরামে বসে থাকাই তো তোমার কাজ! চাকরী করতে তো যেতে হচ্ছে না? বিনা কাজে রাণীর মত বসে থাকবার জন্য বাপের বাড়ী থেকে কত সম্পত্তি এনেছ?'

"কিছু আনিনি, তা তো ঠিকই। ওঁর একদিনের সিগারেটের খরচ দেড়টাকা, ঝিয়ের মাইনেও তাই। বাপের বাড়ী থেকে যখন কিছুই আসেনি তো চাকর বাকর আসবে কোত্থেকে? পরের দিনই ঝিটাকে ছাড়িয়ে দিলেন। প্রসবের দিন যতই এগুতে লাগল, ছোট ছোট কাজ ততই ভারী হয়ে উঠল। বারবার

কুঁয়ো থেকে জল আনতে খুব কষ্ট হ'ত। বাসন মাজতে মাজতে হাত ঠাণ্ডায় হিম হয়ে যেত। একবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলে বসলাম, কাঠের আগুনের পোড়াবাসন মাজতে বড্ড কষ্ট হয়, এ মাসে কয়লা আনিয়ে নিলে ভালো হয় না?'

মুখ ভেঙচে বললেন, 'কি আশ্চর্য! দরকার নেই। যেখানে একপয়সায় কাজ হতে পারে সেখানে তুমি চার পয়সা খরচ করতে চাও। জানো তো, কয়লার খরচ কাঠের দ্বিগুণ। পয়সা কি গাছে ফলে?'

আমি ভীষণ রেগে গেলাম, আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, 'ঠিক বলেছো, আমার বেলায় খরচ কমাবার কথা ওঠে, না? নিজের বিলাসিতার জন্য—সিগারেট, তাস খেলায় খরচ কম করার কোনো প্রশ্নই উঠে না। পোয়াতিকে নিজের হাতে কাজ করবার উপদেশ যে ডাক্তার দেন তিনি বোধহয় বলেন না যে, সিগারেট খাওয়া হার্টের জন্য কত খারাপ ও তাতে কি কি অসুখ হতে পারে।'

'চুপ কর। এর মধ্যে উনি বলবার কে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা উপার্জ্জন আমি করছি সে আমার ইচ্ছেমত খরচ ক'রব। তুমি তো একটি পয়সাও আনতে পারছ না।'

'তোমার যদি এই ইচ্ছে তো সোজাসুজি বলে দাওনা? আমি আমার উপযুক্ত কোনও চাকরী করবো।'

'চমৎকার! চাকরী করাটাই শুধু বাকী। কোনও ডাক্তার কিংবা একটরকে বিয়ে করতে তো সুখে স্বচ্ছন্দে...'

"আমার নিজের উপর অনুকম্পা হল। আসন্ন প্রসবা নারীর প্রতি যার এতটুকু দয়া নেই সে কি মানুষ? তার সঙ্গে যে কথা বলে সেও জানোয়ার...."

"প্রসব হবার আগে পর্যন্ত আমাকে ঘরকান্নার সব কাজ ক'রে এখানেই থাকতে হল। ছেলে হওয়ার পর ছেলের মুখ দেখে আমি সব দুঃখ ভুলে গেলাম। ভাবলাম ছেলে দেখে উনিও

নিশ্চয় বদলে যাবেন। এই রকম ভেবে আবার মিথ্যে আশার ফাঁদে পড়ে আমি তিনমাসের বিট্টুকে কোলে নিয়ে ফিরলাম।"

"ছেলে দেখে বাপের আনন্দ হলো বটে, কিন্তু বেশী নয়। এ সীমিত আনন্দে এত বেশী নয় যাতে আমার ভবিষ্যতের কোন রূপান্তর হলো না। বরঞ্চ দুঃখ কষ্ট বেড়েই চলল। রাগ করবার আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেলেন। একদিন বললেন, 'যখনই দেখি, তখনই ছেলে কাঁদছে। বাড়ী ফিরতেও ইচ্ছে করে না।' রাতে ওর পেচ্ছাপের কাপড় বদলানো আমাকে একাই করতে হ'ত। তারপরে বিছানার চাদর বদলানো—ততক্ষণ ও পড়ে পড়ে কাঁদত।

'ছিঃ ছিঃ, এটা বাড়ী না সরাইখানা ? সারাদিন নিশ্চিন্তে ঘুমোবে আর রাত্তির হলেই এই শানাই এর পোঁ। আমি এখানে থাকবো কি থাকব না ? কি চাও তুমি ?'

"আমি চুপ ক'রে থাকতাম ; যে বুঝতে চায় না তাকে জবাব দিয়ে তো কোনও লাভ নেই ? বিট্টুকে বুকে চেপে শুয়ে যে আনন্দ পেতাম তাতে ওঁর গালাগাল ভুলে যেতাম। এর জন্য আমি সব সহ্য করতে পারি।"

অতীতের দিনগুলি ভানুর কি কষ্টেই গেছে জেনে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। ওদের দাম্পত্যজীবনে আজ সুখের লেশমাত্র নেই। বেচারী, কি নিয়ে বেঁচে আছে ?

"দুঃখকষ্টে পড়লে দাদা, স্ত্রীর সহায় একমাত্র স্বামীই হতে পারে, কিন্তু সে তো আমার এ জীবনে হবার নয়। অন্ততঃ বিট্টুকেও যদি ভালবাসতেন তো আমার কষ্টের কিছু লাঘব হত।"

"ভানু !" বলে ওর দিকে তাকালাম। আমার চোখ দু'টি ভিজে উঠেছিল। ভানু কিছুই বলল না।

"তুমি কত বদলে গেছ ভানু।"

কেমন যেন হেসে জবাব দিলে, "একে কি বদলানো বলা চলে ? আগের সে ভানু মরে গেছে দাদা, আর সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে তার মান, অভিমান, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস।"

ঘড়িতে দুটো বাজল। যেন ঘড়িও বলল, ঠিক ঠিক।

"আচ্ছা, যেতে দাও এসব কথা। যদি বলো, তো একটু সিনেমা দেখে আসা যাক্। এতে মনের গুমোট ভাবটা কাটবে।"

তক্ষুণি উত্তর না দিয়ে কিছুক্ষণ পরে ভানু বলল, "আটমাস হয়ে গেল সিনেমা আর দেখি না।"

আমি থতমত খেয়ে গেলাম—এরও পিছনে কি কোনও দুঃখের কাহিনী আছে?

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?"

"আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে ওঁর লজ্জা করে, তাই সিনেমা দেখাই ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন। কি হয়েছিল?"

"কি আর হবে? একবার একটা খুব ভাল ইংরাজী ফিল্ম এসেছিল। ফিল্মটার খুব সুখ্যাতি শোনা গিয়েছিল। উপন্যাসটা পড়ে ওটা দেখার ইচ্ছে আরও বেড়ে গেল। ওঁকে যখন বললাম, উনি বিদ্রুপ ক'রে উঠলেন, ইংরাজি সিনেমা দেখবে তুমি? সিনেমার ইংরাজী বুঝতে পারবে? সে তো আমরাও বুঝি না।

'যেখানটা বুঝবো না তুমি বুঝিয়ে দিও।'

'তোমার মত একটা ধাড়ীকে সঙ্গে বসিয়ে ইংরাজী বোঝাব? লোকে কি বলবে? আমার কি লজ্জা-শরম নেই?'

"আমারও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। তারপর কখনও সিনেমার কথা তুলি নি। ওঁর সঙ্গে সিনেমা যাওয়া ওখানেই শেষ। উনি বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সিনেমা দেখতে যেতেন, আমিও পাশের বাড়ীর মাসীমার সঙ্গে চলে যেতাম। কিন্তু এভাবে সিনেমা দেখতে কি আর ভাল লাগে? না দেখলেই বা কি? তাই সিনেমা দেখা একেবারে ছেড়েই দিয়েছি।"

"তোমার ইংরাজি জ্ঞান আছে, জামাইবাবু কি জানেন না?"

"আমি কতটুকুই বা জানি? উনি এবিষয় কিছুই জানেন না। জানতে পারলে কি আর রক্ষে আছে? আমার কথাবার্তায় কখনো

যদি কোনো ইংরাজি শব্দ বেরিয়ে পড়ে তো বলেন, 'সাবাস, সদ্য বিলেত ফেরৎ মনে হচ্ছে যে। কোন কনভেনটে আপনি শিক্ষাপ্রাপ্ত করেছেন ম্যাডাম?' উনি যে ব্যঙ্গ করছেন সেটা আগে বুঝতে পারতাম না। আমি ওঁর সামনে কখনও ইংরাজি বই পড়িনি। বিয়ের পর যখন এখানে আসি কত আশা ছিল, ইংরাজি বই পড়ব, ইংরাজি ফিল্ম দেখব, ইংরাজির জ্ঞান বাড়াব, উনিও নিশ্চয় সাহায্য করবেন আমায়। এখন ভাবলে হাসি পায়, কি বোকাই ছিলাম তখন।

"মাঝে মাঝে ওঁর বন্ধুরা আসেন। তাঁদের কথাবার্তায় যোগ দিতে গেলে জানি, পরে আমায় অপমান সইতে হবে।

"ওঁর কথাবার্তার ধরণ কেমন জান? 'ভগবান আছেন কি নেই? নেই—কি করে বলতে পার—দেখতে পাওয়া যায় না তাই। হাওয়াও দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের গায়ে তার ছোঁওয়া তো লাগে, নাকে গন্ধও লাগে। ভগবান আছেন তার কোন প্রমাণই যখন নেই, তো ওঁর জন্য নিরর্থক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করার চেয়ে, তা দিয়ে লোকে অন্যান্য ভালকাজ করতে পারে না?' এই ধরণের ওঁর কথা, ঠিকই তো—গাঁয়ে কি আরও চারটে ক্লাব খোলা যায় না? প্রত্যেককে বিনাপয়সায় সিগারেট বিতরণ করা যায় না? চাকরী না করেই মাইনে পাওয়া যেতে পারে, তেমন কোনো উপায় কি বার করা যায় না? ফিল্ম স্টারদের সঙ্গে ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থাও কি করা যেতে পারে না? আরও শোন, 'আমাদের সরকার একটি গবেট—নেহেরুর নেতৃত্ব শেষ হয়ে যাক, ওর জায়গায় হিটলারের মত কেউ আসলেই ভাল, যে এসে এ বিলাসী লোকেদের শায়েস্তা করতে পারবে।'

"তারপর ভগবানের আলোচনা থেকে রামায়ণ, মহাভারতের দিকে মোড় নেয়।"

"এ মহাভারতও একটি আজগুবি বই। বরদান ও অভিশাপের

কথায় ভরা। কান থেকে ছেলে হয় কখনও শুনেছ? তবে, দ্রৌপদী খুবই ভাগ্যবতী বলতে হবে।'

'আচ্ছা, দ্রৌপদী, কুন্তী এদের সবাইকে কি পতিব্রতা বলা চলে?'

'তখনকার দিনে, যার যত বেশী স্বামী সে ততই পতিব্রতা…'

সবাই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

'ছিঃ ছি, আমাদের মত লোকেদের কানে আঙ্গুল দিতে হয়। কত নীচ এরা। আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতিকে এভাবে অপমান ক'রে ওরা কি সুখ পায় জানিনা।"

"তারপর সিনেমার কথা আরম্ভ হয়—

ওদের কথাবার্তা নিজে না শুনলে বোঝা যায় না ওরা কোনদরের লোক। এমনিতে কেউ গ্রাজুয়েট, কেউ পোস্ট-গ্রাজুয়েট। তবে কিনা, ডিগ্রী ও সংস্কার দুটো একেবারেই আলাদা জিনিষ তো?"

"যদি আমি বলি, 'আপনারা সব শিক্ষিত হয়েও সর্ব্বদাই এরকম ভুল ধরবার চেষ্টা করেন কেন, তখন ঝট করে বলেন, 'আপনি ভিতরে যেতে পারেন, আপনার অমূল্য পরামর্শ কেউ চায় না।'

"ওদের কফি, চা সব ক'রে দি। ওদের সঙ্গে একটু আলাপ পরিচয় হওয়ার পর, ওদের কথাবার্তায় মাঝে মাঝে যোগ দেবার সাহস করেছি। কিন্তু আমি কিছু বললেই উনি সকলের সামনে আমাকে অপদস্থ করতে ছাড়েন না। দু'একবার এরকম হওয়ার পর আমিও নিজেকে সামলে নিলাম।"

"সত্যি বলতে, ওঁর নিজেরই বন্ধুদের উপর বিশ্বাস নেই। তাই ওঁদের সঙ্গে আমার বেশী কথা বলা পছন্দ নয়। কিন্তু বেশীর ভাগ কথাটা ওঁদের দিক থেকেই আরম্ভ হয়। তাই উত্তর দিতে হয়, অভদ্রতা তো করতে পারি না?"

"তবে বাড়ীতে ওদের আনলেন কেন?"

"দেখাবার জন্য, আবার কি? — কখনও কখনও অবশ্য ওঁরা নিজেরাই আসেন। ওঁরই তো বন্ধু। সবাই এক গোয়ালের গরু।"

"কেন, জামাইবাবু নিজে কি কোনও বন্ধুর বাড়ী যান না? ওঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না?"

"পরস্ত্রীদের সঙ্গে উনি নিজে ইচ্ছামত কথা বলতে পারেন, হাসি-তামাশাও করতে পারেন, এতে কোনও দোষ হয় না। কারণ, উনি নিষ্পাপ পরম পবিত্র। কিন্তু নিজের স্ত্রীর কথাই আলাদা। অন্য কেউ ওঁর স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না। আসল কথা, ওঁর নিজেরই নিজের বৌয়ের বা বন্ধুদের উপর বিশ্বাস নেই। নিজের বৌএর ব্যক্তিত্ব বলে কিছু আছে সেটাও ওঁর অজানা। তাই ওঁর বন্ধুরাই ওঁকে অপচ্ছন্দ করছেন, উনি বুঝতে পারেন না।"

"তোমার যদি কিছুই পছন্দ নয় তো শিক্ষিতা মেয়ে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন?"

"ওটাও দেখাবার জন্য—একটা মোটর বা ভালজাতের কুকুর থাকলে লোককে দেখিয়ে যেমন ভাল লাগে সেরকম শিক্ষিতা স্ত্রীও একটা দেখাবার জিনিষ। আজকাল বিয়ের আগে লেখাপড়া জানা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার একটা নতুন সখ উঠেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার সমর্থন করে, তাদের প্রতি অতিমাত্রায় সহানুভূতি দেখান আর পূর্ব পুরুষদের ঘাড়ে সব দোষ চাপান, ঐ সখেরই অঙ্গ বিশেষ। কিন্তু নিজের বিয়ে হবার পরই সব শেষ। তখন স্বামীর পুরুষত্বের ভাব জেগে ওঠে—সে হল বড়, স্ত্রী হল ছোট।"

"কোনও মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পর তার প্রতি কি ন্যায়, অন্যায় হচ্ছে এ আর কে ভাবছে? তারও নিজের মতামত ও বুদ্ধি বিবেচনা আছে, আর সবচেয়ে বড়কথা তারও আলাদা ইচ্ছাশক্তি আছে এ আর ক'জন পুরুষে মেনে নিচ্ছে?"

"বিয়ে হবার পরই স্ত্রীর লেখাপড়ার কদর থাকে না। বোধহয় তার উপর ওদের হিংসাও হয়। কোন মেয়ে যদি নিজের আলাদা মত প্রকাশ করে, কিংবা কারুর ভুল শুধরিয়ে দেয় তো অহঙ্কারী বলা হবে; দোষটা লেখাপড়া জানার। সে বেচারীও কি করবে—তর্ক-বিতর্কে যোগ দিয়ে সেও ভুলে যায় যে এরা পুরুষ।"

"একদিকে ওরা মেয়েদের মধ্যে অভিনেত্রীদের মত ভাবভঙ্গী দেখতে চায়, আর রূপেও নতুন যুগের পুতুল। কিন্তু ব্যবহারের বেলায়, ওদের আগেকার কালের সতী সাধ্বীরও কড়া হতে হবে। সেকেলে বুড়ীর মত খোঁপা বেঁধে শাড়ী জড়িয়ে থাকা আজকাল পুরুষেরা কেউই পছন্দ করে না। কিন্তু যারা স্ত্রীর সাজগোজে নূতনত্ব চায়, তারা স্ত্রীর মানসিক উন্নতিতে বাধা দেয় কেন? সেকালই যখন নেই তখন সেকালের ধারণাই বা কি করে থাকতে পারে? এটা লোকে কেন স্বীকার করে না?"

"দু'চার জন পুরুষ যা করছে তার সব দোষই তুমি সব পুরুষের ঘাড়ে চাপাচ্ছো যে ভানু?"

"না আমি তা করছি না। কিন্তু আমার তো ঐ দু'চারজনকে নিয়েই কারবার।"

"এত নীচ প্রকৃতির কেউ হতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।"

"হয়। একটুক্ষণ তোমার পুরুষত্বের অহঙ্কার ছেড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে। পুরুষ কখনও স্ত্রীকে নিজের সমান ভাবে না। স্ত্রীকে সর্বদা হীন মেনে নিয়ে পুরুষ শাসন করে। আমার বই পড়া বারণ। সিনেমা দেখতে পাব না, বাইরের দরজায় দাঁড়াব না, পরপুরুষের সঙ্গে হেসে কথা বলা অপরাধ। আমি কি সোনা রূপোর একটা জড় মূর্তি, যাকে সকলের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আমাকে বিশ্বাস ক'রে আমার উপর কোনও দায়িত্ব দেওয়ায় ওঁর আপত্তি কিসের?"

আর আমি কিছু বললাম না।

"কোনো লেখকের বই পড়লে তার মতামত নিজের মনোমত না হলে তাঁর বই আর আমরা পড়ি না। কোনো সিনেমা পছন্দ না হলে তার বিষয় আর ভাবি না। সেইরকম যাদের সঙ্গে কথা বলি তাঁদের, কার কেমন স্বভাব জানতে পারলে, সেই অনুসারে তাঁদের সঙ্গে ব্যবহার তো করবো। যে কটি লোকের কথা

বলছিলাম তাঁদের মন যথেষ্ট উন্নত হওয়া দরকার। কখনও...কিন্তু যাক্ গে . . . ”

ভানু একটু হাসল। “সেই থেকে বাজে কথা বলে তোমার সময় নষ্ট করছি না ?”

“কি ন্যাকা ন্যাকা কথা বলতে আরম্ভ করেছ ?”

“তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার জন্য এখন ওটারই দরকার পড়েছে।” বলে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কফি নিয়ে এল। ভানু যখন রান্নাঘরে গেল তখন আমি বই নিয়ে বসলাম। বইএর অক্ষরগুলোর বদলে ভানুর কথা, ভানুর কান্নাই পাতায় পাতায় ভাসছিল। দুঃখের সব কথা বলতে পেরে সে স্বস্তি পেয়েছে। কিন্তু প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে যে কষ্ট ও পাচ্ছে তার শেষ কোথায় ? কেমন করেই বা হবে ? দেখতে সুন্দর, শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, তবুও ওর স্বামী ওকে পছন্দ করে না কেন ? কত সুখের সংসারই না হতে পারত ওঁর, তার বদলে এত দুঃখময় ক'রে তুললেন কেন ? ভানুরা যাতে সুখী হয় সেজন্য আমি কি করতে পারি ? প্রশ্নের পর প্রশ্নই মনে জাগছে, উত্তর একটীরও নেই। আমার এত আদরের বোনটি যখন এত কষ্টে আছে আমি তাকে আমার মনের দুঃখ প্রকাশ ক'রে সান্ত্বনাও দিতে পারছি না।

বই বন্ধ ক'রে আমি পায়চারী করতে লাগলাম।

এর মধ্যে হঠাৎ ধূপদানটার কথা মনে পড়ে গেল। ভানুকে জিজ্ঞাসা করলাম, “তুমি যে ধূপদান কিনেছিলে কই সেটা তো কোথাও দেখছি না ?”

“হায়রে, সেটা তো কবে ভেঙ্গে গেছে। একবার আমার উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন, তাই ওটাকে ভেঙ্গে রাগ মেটালেন। হাতে যাই থাকুক না কেন রাগ হলে সেটা মাটিতে আছড়ে ফেলবেন। আমার হাত থেকে 'কাপ' পড়ে গেলে হৈ-চৈ বেধে যায়। উনি জেনেশুনে এভাবে জিনিস ভাঙ্গেন তো ওঁর উপর চোখ রাঙানর

কেউ নেই। উনি যে টাকা উপার্জন করছেন! কিছু ভাঙ্গলে আবার কিনতে পারবেন। কিন্তু আমি কোথা থেকে কিনবো?"

এইভাবে কষ্ট পেয়ে পেয়ে ভানুর আবোল তাবোল বলার অভ্যাস হয়ে গেছে নিশ্চয়।

ন'টার মধ্যে জামাইবাবু এসে গেলেন। আগে কখনও ওঁকে এত নিষ্ঠুর ও কঠোর মনে হয়নি। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

বললেন, "কি হে, আমায় যে গিলে খাচ্ছেন? খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, আমি খেয়ে নিয়েছি। ভানু বোধহয় আপনার অপেক্ষায় বসে আছে।"

"হ্যাঁ,...ও যে পতিব্রতা স্ত্রী।" হেসে তোয়ালে নিয়ে চলে গেলেন। কথায় কথায় ব্যঙ্গ। কারুর কারুর বলার ধরনই এই রকম। আমি বাইরে চাতালে গিয়ে দাঁড়ালাম।

জামাইবাবু একটি অদ্ভুত লোক। কিন্তু আমি ওঁর সম্বন্ধে এখনও একেবারে নিরাশ হইনি। আমার মন বলছে—কখনো না কখনো ওঁর মধ্যে পরিবর্তন আসবে। নিজের ভুল বুঝতে পারবেন। এই কঠোরতার আবরণ ছেড়ে আসল মানুষটা বেরিয়ে আসবে। এতে সন্দেহ তো নেই তবে অনেক সময় লাগতে পারে। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে ভানুকে।

পরের দিন আমার যাবার আগে ভানু যেন কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু পারছিল না। "দাদা", বলেই চুপ হয়ে গেল। "কি?" বলে ওর দিকে তাকালাম।

"তোমার কাছে আসতে লজ্জা করছে দাদা! যখন সকলে জেনে ফেলে যে, নিজের বাড়ীতেই আমার মান নেই, তখন অন্যে আর আমাকে কি মান দেবে? লতাগাছকে ধরে টানলে তার আশ্রয়স্থলই নড়ে ওঠে। কথার পিঠে কত না কথা বেড়ে গেল। আমাদের বিষয় তুমি কোনও হীন ধারণা নিয়ে যেও না, এসব

ভুলে যেও।” ভানুর চোখ জলে ভরে গেল, গলাটীও ধরে এল। তা সত্বেও এক বিচিত্র হাসি তার চেহারার উপর খেলছিল।

ভানুর কাঁধে হাত রেখে বললাম, “ভাষণ আপনার কি শেষ হল? তুমি একটি আস্ত পাগল। ভাই-এর বিষয় তোমার চমৎকার ধারণা। তুমি যতই বল, জামাইবাবুকে আমি ভুল বুঝছি না। রাগের মাথায় যাই বলুন না কেন, বাড়ী ফিরলে ওসব কথা মনেই থাকে না ওঁর, আবার বেশ কথাবার্তা নিজে থেকেই তো আরম্ভ করে দেন। কি ভুল বলেছি?”

“না, তা কেন? আমার যখন রাগ হয় নিজে থেকে কক্ষনো আগে কথা বলি না, উনিই আগে বলেন।”

“জামাইবাবু যে একেবারে অভদ্র, এ তুমি বলতে পার না।”

“যে ঘড়া গরলে ভরা তাতে যত অমৃতই ঢালো সব গরল হয়ে যাবে। ওঁর ঐ ভদ্রতাটুকু আমার কি কাজে লাগছে?”

“জামাইবাবুর বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেতে বসেছে বটে, কিন্তু ভানু তুমি তিলকে তাল ক'রে মাথা কেন ঘামাও বলতো? আমার বিশ্বাস, কোনও না কোনো দিন উনি নিশ্চয় বদলে যাবেন।”

ভানু কিছু বলল না। আমি আবার বলতে আরম্ভ করলাম, “ছোটবেলায় যেভাবে লালিত-পালিত হয়েছেন তার দোষেই উনি এরকম স্বার্থপর। বিয়ের আগে পর্যন্ত মেয়েদের ভালবাসা কেমন তার কোনও অভিজ্ঞতা হয়নি। মা বোনের স্নেহে যদি মানুষ হ'তেন তো নারীর হৃদয় বোঝবার ক্ষমতা হ'ত। ওঁকে ঠিকপথে চালাবার কেউ ছিলনা, ভুল পথে গেলে শাস্তি দেবারও কেউ ছিল না। যখন যা ইচ্ছে তাই করেছেন, এমন লোকের সুঅভ্যাস হবে কোত্থেকে? তুমি কেবল নিজের জিদ নিয়েই আছ—এরকম করলে কি কিছু লাভ হয়? তুমিই বল। আমাকে ভুল বুঝো না।”

“আমি জেদ ধরে বসে আছি, এ তোমার একেবারে ভুল ধারণা দাদা। বিশ্বাস কর, ওঁকে বদলাবার জন্য আমি কি-না করেছি। কত আশা নিয়ে এসেছিলাম। প্রথম দিকে অবশ্য কিছু বুঝতাম

না, তাই বেশ আনন্দেই থাকতাম। পরে আস্তে আস্তে সব বুঝতে আরম্ভ করলাম। দিনে পাঁচ প্যাকেট সিগারেট খাওয়া, মাঝরাতে বাড়ী ফেরা, ছুটীর দিনে বাড়ীতে না থাকা, আমার একটু ভুল হলেই চীৎকার ক'রে বকা—প্রথম দিকে এসব অদ্ভুত লাগলেও আমার দুঃখ হত না। তখন ভাবতাম যেমন সংসারের দায়িত্ব আমার উপর এসেছে, ওঁর উপরও তো তাই, পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। তাই উনি দোষ করলেও আমি কিছু বলতাম না। অবশ্য কয়েকবার ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি নি, এমন নয়—

'সিগারেট খাওয়ার তোমার খুব সখ, না ?'

'সখ ? ও ছেড়ে আমি তো থাকতেই পারি না। ওটা যে আমার প্রাণ।'

'তোমার এই প্রাণটার জন্য মাসে কত খরচ হয় ?'

'টাকা তিরিশেকের চেয়ে কিছু বেশীই...'

'এত টাকা নষ্ট করা কি...'

'ভানু, তুমি তো জান না, সিগারেট ছাড়া আমি বাঁচতেই পারি না।'

'এখন তো আমিও এসে গেছি, তোমার খরচ বেড়ে গেছে, সে সব তো বুঝতে হবে।'

'তাতে কি হয়েছে ?'

'সিগারেট খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয় সে তো জানই। আস্তে আস্তে এটা ছেড়ে দিলে বা কম করে দিলে হয় না ?'

'বেশ, দেখা যাবে।'

'ব্যস, দেখা ঐ পর্যন্তই ! তারপর যখনই ও বিষয় কথা তুলেছি, কখনও পাশ কাটিয়ে গেছেন কিংবা বিরক্ত হযেছেন, তারপরেই কিন্তু ভীষণ রেগে গেছেন। ওসব নিয়ে আমায় মাথা ঘামাতে হবে না, আর এও জানিয়ে দিলেন যে, ওসব কথা তোলবার আমার অধিকার নেই। তারপর আর কি করতাম ? তারপর থেকেই ওঁর মুখের উপর জবাব দিই, ওঁর সমালোচনা করি আর মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে কথা বন্ধ করে দিই। ওঁকে বদলাতে পারলে আমিও

আর সকলের মত সুখী থাকতে পারতাম এই তো আমার ইচ্ছে ছিল। তুমি বলছ, আমি ঠিকমত চেষ্টা করি নি। আচ্ছা বেশ, আমি আবার চেষ্টা করব। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো ?"

"ভানু, তোমরা যাতে সুখী হও সেই তো আমি চাই।"

মুচকি হেসে ভানু বললে, "জান দাদা, এখন আমি পাপ-পুণ্য, কর্মফল, পুনর্জন্ম সবই বিশ্বাস করি।"

"হতে পারে এসব সত্যি। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ সত্যের পেছনে এ জীবনের প্রত্যক্ষ সুখকে ছাড়া কি কোনও কাজের কথা ? আমি আরও একবার বলতে চাই ভানু, জামাইবাবু কোনও ভুল কাজ করলে ওঁকে ক্ষমা করো। স্বামীর ভালোটা যেমন স্ত্রী নিতে পারে তেমন তাঁর মন্দটাও নিতে হবে। যদি কিছু না মনে কর তো একটা কথা বলবো। স্ত্রী যে স্ত্রী, সে কথা পুরুষে কখনও ভোলে না। এভাব পুরুষের ভেতর সর্বদাই থাকে। পাতার উপর কাঁটা পড়ুক বা কাঁটার উপর পাতা, কথা একই, ক্ষতি শুধু পাতারই হয়, কাঁটার নয়।"

"বিলক্ষণ! পরিবারের প্রতিষ্ঠা রাখাটা শুধু একলা স্ত্রীরই কর্ত্তব্য না ? পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে এছাড়া আমার জন্য আর কি সদুপদেশ হতে পারে ?"

ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ভানুর দিকে বাড়িয়ে বললাম, "এটা তুমি রাখ ভানু, কখনো কাজে লাগতে পারে।"

ভানু হেসে বলল, "ও থাক দাদা, আমার আবার কি দরকার পড়তে পারে ?"

"কি রকম দরকার হতে পারে তা আমি জানি। তুমি রাখতো আগে, নয় তো আমি ভীষণ রাগ করব।"

"করো রাগ। আমার কি ?"

"তার মানে আর আমি এখানে আসব না। এই তো ?"

"কেন, ওর সঙ্গে এর কি সম্পর্ক ? আচ্ছা বাবা রাগ করো না,

দাও আমায়।" বলে আমার হাত থেকে নোটটা নিল। একটু অপ্রস্তুত হয়ে আবার বলল, "তোমার থেকে টাকা নিতে আমার কোনও আপত্তি নেই দাদা কিন্তু আমার এ অবস্থার জন্য লজ্জা হচ্ছে যে।"

"আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো তো আর একটা কথা বলছি। তোমার পরণের কাপড় যথেষ্ট আছে তো?" জিজ্ঞেস করতে গিয়ে নিজেরই সঙ্কোচ লাগল। ভানু আশ্চর্য হয়ে তাকাল, বলল,—

"কেন?"

"আচ্ছা বলই না ভানু?"

"হ্যাঁ সব আছে।"

"সত্যি বলছো?"

"হ্যাঁ সত্যি বলছি দাদা! মা তো কিনে দেয় আমায়।"

"থাকে তো ভালই, কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ। তুমি খুশি না থাকলে আমিও খুশি থাকতে পারি না। তোমার যে জিনিসের যখন দরকার আমায় নিঃসঙ্কোচে ব'লো, কেমন?"

"এবার থেকে আমার যা কিছু দরকার হবে, তোমার কাছেই চেয়ে নেব।"

"তা বেশ। বড় ভালো মেয়ে তুমি, তাহলে এবার চলি?"

"রাও সাহেব, একটা সন্দেহ থেকে গেল কিন্তু। আপনি যে নিজেকে আমার আনন্দেই আনন্দিত বলছেন, সেটা কতদিন থাকবে বলতে পারেন?" বলেই একেবারে হেসে ফেলল ভানু।

"যতদিন সুশীলা না আসছে।"

"তারপর?"

"জানি না।"

শুনেই ভানু বিবর্ণ হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে আমার দিকে চাইল, "সত্যি তুমি বদলে যাবে?"

"এ প্রশ্নের উত্তর তোমার মনই জানে ভানু।"

ভানু একটু হাসল। আমি ওর হাতটা ধরে ফেলেই ছেড়ে দিলাম। আমার হবু জামাইকে কোলে তুলে আদর করে নামিয়ে দিয়ে, বাইরে পা বাড়ালাম।

ভানুর কথা ভেবে ভেবে আমার মনে শান্তি নেই। ওকে আশ্বাস দেবার জন্য আমি অনেক কিছুই বলেছিলাম। কিন্তু ওকে যা ভরসা দিয়েছি তার কি কোনও সার্থকতা আছে? ভানু কোনদিনও কি স্বামীর ভালবাসা পেতে পারে? কি ক'রে বিশ্বাস করব? ভানু যাতে সুখী হয় তারজন্য আমি কি কি করতে পারি? জামাই-বাবুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে যদি ওঁর বিশ্বাসের পাত্র হতে পারি, তারপর ওঁর ভুল শোধরাবার চেষ্টা করি তো...? কিন্তু উনিই যদি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেন? অনেক ভেবেচিন্তেও কিছু ঠিক করতে পারলাম না।

ভানুকে দেখবার ইচ্ছে হলেই আমি ওদের বাড়ী চলে যেতাম। একবার ভানু জিজ্ঞেস করেছিল, "দাদা! তুমি আমার জন্য লাইব্রেরী থেকে বই এনে দিতে পার?" ভানুর দিকে তাকাতেই ওর আগের সব আশা আকাঙ্খার কাহিনী আমার মনে পড়ে গেল। ভানু বই পড়তে খুব ভালবাসত। বলতো বই পড়ে কত কি জানতে পারা যায়, তা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা কত দুর্ভাগ্যের কথা। ওর এত রুচিশীল মনটার পরিচয় পেয়ে ভাবতাম একদিন ও বেশ বড় লেখিকা হবে। ওকে সুযোগ দেওয়া দরকার।

"এখানে আসার পর বই পড়বার খুব ইচ্ছে ছিল। আমাদের গাঁয়ের লাইব্রেরীতে আর ক'টাই বা বই? কিন্তু পড়বার বই পাই কি করে?"

"তা বেশ। আমি তো জানতাম না, যখন বলেছ অনেক বই এনে দেব। যত খুশি পড়। আমিও দেখি, কত বই তুমি পড়তে পারো।"

ভানু আমার থেকে কিছু চাইল বলে আমার খুব ভালো লাগল।

সামান্য কিছু করবারও তো সুযোগ পেলাম। পরের দিন সেন্ট্রাল লাইব্রেরীতে দুটো কার্ড করালাম যাতে একসঙ্গে চারটা বই নিতে পারি। প্রথম দিন চলমের 'স্ত্রী' বইটা নিলাম। ওটা দেখতেই ভানু বলে উঠল, "এটা তো আমার কাছেই আছে দাদা, এটা নিয়ে আমাদের মধ্যে ঝগড়াও হয়ে গেছে।"

"বই নিয়ে ঝগড়া? সে আবার কি?

"তবে, এতদিনে তুমি কি বুঝলে? এ বাড়ীতে ঝাঁটা নিয়েও ঝগড়া হতে পারে। বিট্টু যদি কোন ঘরে ঝাঁটা ফেলে রাখে তো খণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। যাক্‌গে বই এর কথা শোন! একদিন আমি এই 'স্ত্রী' বইটা পড়ছিলাম, উনি দেখেই রেগে আগুন। বললেন, 'চলমের কোনো বই তোমার পড়া উচিত নয়।'

"কেন?

"ওতে কিছু নেই। একেবারে বাজে বই।"

"কিন্তু একথা তো তুমি বইটা পড়বার পরই জেনেছ না?"

"তা নাও হতে পারে। আমি বলছি এসব বাজে বই।"

"হতে পারে বাজে বই। কিন্তু নিজে না পড়লে তা বুঝবো কি করে?"

'চুপ কর। আমার কথার উপর কথা বলো না। তুমি মানুষ না জানোয়ার।'

'মানুষের কাছে আমি মানুষ, আর জানোয়ারের কাছে জানোয়ার।'

"আমার গালে এ দাগগুলো যে দেখছ সেসব এরকম ঘটনা ও কথাবার্তার ফল। রেগে দাঁত কিড়মিড় করে বইটা কেড়ে নিয়ে কুচিকুচি ক'রে দিলেন। আমার মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠল। যখন গাঁয়ে গেলাম চলমের যত বই পেলাম সব কিনে নিলাম। ভুল করিনি তো? কেউ কাউকে জোর ক'রে বদলাতে পারে এমন শুনেছ কখনও!"

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। উনি পুরুষ বটে, কোনও স্ত্রীর

স্বামীও। কিন্তু স্বামীর দাবীতে স্ত্রীকে তার পছন্দ মত বইও পড়তে দেবেন না....

"ছিঃ কি পাগলামি ?"

"পাগলামি নয়, এ হল দূরদর্শিতা। চলমের বই পড়ে মেয়েরা আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলবে, ওদের মনে বিদ্রোহের ভাব জেগে উঠবে যে। অন্ততঃ পুরুষদের মনে এ ভয় সর্বদাই থাকে।"

কিছুক্ষণ বাদে জিজ্ঞাসা করলাম, "চলমের বিষয় তোমার কি মত ?"

"ওঁর কথা ঠিকই। কিন্তু বাস্তবে চলে না।"

"যেটা সত্য, সেইমত চলতে গেলেই অনর্থ বাধবে। কারণ সকলে তো আর সেটা মানছে না ? তুমি বলছ, নিজের পচ্ছন্দমত বই পড়ার অধিকার সবার আছে। কিন্তু এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করারও পেছনে কোনও স্বার্থ, যুক্তি, অবশ্যই আছে। আমি যদি বলি আমার মাকে চিঠি লেখার জন্যও ওঁর অনুমতির দরকার, তা বিশ্বাস করবে তুমি ? একবার ইনি কোনও পর্বে শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে এঁর আদর যত্নের কিছু ত্রুটি হয়েছিল। তাতেই রাগ হয়ে গেল।......একবার ওঁর অসুখ হয়েছিল তখন ওখান থেকে কেউ দেখতে আসেনি তাতেও অভিমান হল। হুকুম হলো আমি আর বাড়ীতে চিঠি লিখতে পারব না। ওখানে যদি কিছু হয়েই থাকে তার জন্য শাস্তি আমি কেন পাব ? এইটাই আমার প্রশ্ন।"

'তোমার প্রশ্ন ও তোমার পতিদেবতার কাছে ঘাট মানছি। কিন্তু এর জন্য তুমি ভেব না। ওঁরা কি পাগল হয়েছেন যে, ওঁর আদর অভ্যর্থনা করবেন না ? তাঁদের পক্ষে বারবার এত দূর আসা যাওয়া কি সোজা কথা ?

"পার্বণের দিনে আমরা দু'জনে যখন আমার বাপের বাড়ী গিয়েছিলাম, ষ্টেশনে কেউ আমাদের নিতে আসেনি। তা নিয়েই ঝগড়া শুরু হল। বাড়ী গিয়েই রাগ ক'রে বসে রইলেন। কাকুতি

মিনতি ক'রে বোঝাবার অনেক চেষ্টা ক'রলাম, অমন করলে আমাদের মান থাকবে না। কিন্তু কিছুই শুনলেন না। আর কোনও উপায় না দেখে মাকে সব কথা খুলে বললাম। তখন মা ক্ষমা চাইল। তবে গিয়ে উনি জলখাবার খেলেন।"

"তুমিই বল, কথায় কথায় এরকম রাগ করলে…"

খিড়কির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে ভানু চলে গেল। মিনিট পাঁচেক পরে এসে বলল, "তোমার কাছে দুটো টাকা হবে ?"

"পাঁচ টাকার নোট আছে বোধহয়। ভাঙ্গানো টাকা নেই। কেন ?

"সে পরে বলব। আগে নোটটা দাও তো।"

ব্যাগ থেকে নোট বের করে ভানুকে দিলাম। ও খিড়কির দিকে চলে গেল। মনে হলো পাড়ার কোনো মহিলা এসে থাকবেন। শুনতে পেলাম, 'পাঁচ টাকার দরকার কি মা ! নিলে কি হল ? দেড় টাকা…'

"তাতে কি মাসীমা। ফেরাবার কোনও দরকার নেই। দশ দিন বাদে ফিরেই তো আসছেন। সংসারে এ সব হামেশাই চলে।"

"তুমি তো সবই জানো মা। দেখ কি দুর্দশাই হয়েছে আমার। কিন্তু আমার কথা ছাড়ো। তুমি নিজে ভালো করে থেকো। সব সময় এত ভেব না। ছেলেটাকে ভাল ক'রে রেখ। আর শোনো রাজুর একটু খোঁজখবর রেখ। তোমার ভাইকে পয়সা না দিতে পারলে কিন্তু…" ওঁর গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল।

"ঠিক আছে মাসীমা। ওর পয়সাও যা আমার পয়সাও তা।"

"আমি তাহলে আসি ?"

"মাসীমা, আপনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কিন্তু বড় ফাঁকা লাগবে ।"

ম্লান মুখে ভানু ভেতরে এসে একপাশে বসল।

"কি আর বলব দাদা ! এঁদের বিষয় ভাবতে আরম্ভ করলেই

নানান প্রশ্ন মনে আসে। মাসীমা বেচারী মেয়ের বাড়ী যাচ্ছেন। এসব হচ্ছে ওঁর বৌয়ের হুকুমে। মানে এ বাড়ীর সব কাজ বৌয়ের আদেশ অনুসারেই হয়। রাগ হলে স্বামী ও শাশুড়ীকে কাটফাটা রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারে। শাশুড়ীকে যখন খুশি বাড়ী থেকে বার ক'রে দিতে পারে। এতবড় শক্তি ওর। মাসীমার একটী মাত্র মেয়ে তাকে বছরে একবারও এখানে আসতে দেয় না। ওর একটী দেওর আছে, এখানেই স্কুলে পড়ে। ওরই নাম রাজু। ওতো বাড়ীর চাকর। মহারাণীর দুটি ছেলেও আছে, শুধু তাদেরই ভালবাসে। ওদের দেখাশোনা সব মাসীমাই করেন, রাঁধেন তাছাড়া সংসারের যাবতীয় কাজ ওঁর ঘাড়েই। রাজু কুঁয়ো থেকে জল তোলে, বাজার করে। ছেলে দু'টোকে বেড়াতেও নিয়ে যায়।"

"তাহলে, মহারাণীর কি কাজ?"

"আরে আগে শোন তো! মহারাণী রাজার সঙ্গে তাস খেলেন, সিনেমা যাওয়া, বেড়াতে যাওয়া, পিকনিক করা, বন্ধুদের বাড়ী বেড়ান, মহিলা সঙ্ঘ, লেডিজ ক্লাব, কত কাজ ওঁর। এসব 'ডিউটী' কি কম? সর্বদাই উনি 'বিজী' থাকেন। সময় পেলে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া, দেওরকে গালি পাড়া, স্বামীকে বকাবকি করা। তারপরই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। উনি হচ্ছেন বড়লোকের বাড়ীর মেয়ে, সঙ্গে অনেক সম্পত্তি এনেছেন। ওঁদের বাড়ীর দেশলাইও রূপোর, তাই এত অহঙ্কার। ওঁর কাছে উচিত অনুচিতের তফাৎ নেই। একবার কোনও বিশেষ তরকারী রাঁধার জন্য হুকুম দিয়েছিল শাশুড়ীকে—বাজারে সেরকম তরকারী না পাওয়াতে উনি 'সাম্বর' রেঁধেছিলেন। মহারাণী খেতে বসে শেষে হুলস্থূল কাণ্ড বাধালেন। শাশুড়ীকে যা খুসি তাই বলল, স্বামীর উপর হুকুম হল 'সাম্বর' না ছোঁওয়ার। উনি মাথা নীচু করে অন্য তরকারী দিয়ে খেতে লাগলেন। মাসীমা মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।"

'বাবা, আমি কি এমন ভুল করেছি যার জন্য ও আমায় এ ভাবে অপমান করবে? তুমি এসব শুনেও . . .'

'থাক্ গে, ওর কথায় তুমি মন খারাপ করো না। ও যেমন বলে তেমন করলে আর ঝগড়া কি ক'রে বাড়বে।'

'দেখেছ, কি অদ্ভুত কথা!'

"গুরুজনদের ছোটদের কথায় চলতে হবে। ওদের বাড়ীতে মায়ের কোনো স্থান নেই। অন্ততঃ বয়সেরও তো সম্মান করা উচিত। আরে আমি নিজেই স্ত্রীর কথায় চলছি, তো তোমার তো কোনো কথাই নেই, এরকমই বোধহয় ভাবেন উনি! আচ্ছা বাবা এরপর থেকে তোমাদের ইচ্ছে মতই সব করব। এবার ক্ষমা কর, রাগ করো না। একটু 'সাম্বর' নাও, তুমি না খেলে আমার তৃপ্তি হবে না।' শেষে মার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে একটু 'সাম্বর' খেলেন। কিন্তু খাওয়া শেষ হওয়ার পরই ওঁর স্ত্রী বাক্স বিছানা বেঁধে যাবার জন্য তৈরী হয়ে গেল। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে বললে, 'স্বামী, স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে চাইছ? যে কাজ করতে আমি বারণ করেছি সেই কাজই করাবার আবার কি দরকার পড়েছিল?' তারপর স্বামীকে বলল, 'এ বাড়ীতে যখন আমার কোন মানই নেই, তো আমার এখানে থাকারও দরকার নেই। তোমরা মা বেটা আরামে থাকো, আমি চললাম। আর স্বামী কিছু বলার আগেই বেরিয়ে পড়ল—উনিও 'সরু, ও সরু শোনতো' বলতে বলতে ওর পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেলেন, স্টেশনে গিয়েও ওকে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। তুমি জানো, সরু কি পাস?"

"পাস না ছাই। শিক্ষিতা স্ত্রী এমন ব্যবহার করতেই পারে না।"

"কি বলছো? উনি হচ্ছেন সরোজা দেবী, বি.এ, খুব ভাল ভাবে পাস।"

"তাই নাকি?" আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না, না?"

"আর ওঁর স্বামী? উনি কি করেন?"

"কলেজে লেকচারার। একেবারে মহাদেব। অবশ্য দেবতার মত ভাল নয়, কিন্তু পাথরের দেবতার মতই মৌন ধারণ করতে

সক্ষম। যার দিকে ঢলেন তাকে মাথায় চড়াতে কসুর করবেন না। সরোজার কথা ভাবলে কিন্তু আমার কষ্ট হয়। মেয়েরা যা কিছু চায় সবই ও পেয়েছে। নিজের ইচ্ছা মত ও কাজ করতে পারে। বাড়ীতে সবাই ওর কথা শোনে। স্বামী ভালবাসে। নিজের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলবার সব সুযোগই পেয়েছে। মেয়েমানুষে এ ছাড়া আর কি চাইতে পারে ? কিন্তু এ সবের অপব্যবহার করছে। স্বামীকে ভালমানুষ পেয়ে ওর মার থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইছে। ওর কথা সকলে শোনে বলে শাশুড়ীর ওপরও হুকুম চালাচ্ছে। কত সুঅবসর ও পেয়েছে জীবনে, কিন্তু সবই মাটি করে ফেলেছে। এইজন্যই লোকে মেয়েদের সম্মান করে না। একদিকে তো বাড়ীতে হুকুম চালাচ্ছে আর অন্যদিকে মহিলা সমিতির মেম্বর হয়ে মেয়েদের অধিকারের জন্য দাবি জানাচ্ছে। লোকে কি হাসবে না ? আরে, যারা এসবের সুযোগ পায় নি তাদের কথা তুলে বড় বড় লেকচার ঝাড়ছে। কিন্তু তুমি নিজে কি করছো ?...আচ্ছা বলতো এসবের জন্য আসল দোষটা কার ?"

"আমার মতে যা কিছু শুনলাম তার জন্য মাসীমার ছেলেই দোষী . . ."

"আমারও তাই মত। পুরুষরা দু'রকম। একরকম যারা নিজের মা, বাপ, ভাই, বোন সবাইকে এত ভালবাসেন যে, বিয়ে করার পর স্ত্রীর সুখ ও দুঃখের দায়িত্ব যে ওঁরই, সেটাও ভুলে যান। আরেক রকম হল, যাঁরা বিয়ের পরই স্ত্রীর গোলাম হয়ে তার কথায় ওঠেন বসেন আর বাকী সকলকে ভুলে যান। এক চক্ষু হরিণের মত এঁরা সর্বদা শুধু একদিকটাই দেখেন।"

"সরোজার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয় নি ?"

"ও আমাকে পছন্দই করে না। আমি মাসীমার সঙ্গে বেশী কথা বলি তাইতেই ওর রাগ। মাসিমা কিন্তু খুব ভালো দাদা। নিজের জীবনে কিরকম কষ্ট পেয়েছেন, সে সব বলে প্রায়ই উনি আমায় সান্ত্বনা দেন। একবার ওঁকে বলেছিলাম, 'পুরুষরা স্ত্রীকে

এতো হেয়-জ্ঞান ক'রে কেন বুঝি না।' বললেন, 'তুমিও মা একটি পাগল। এখন তো ওসব বালাই নেই বললেই চলে। তোমার স্বামীর মত লোক আজকাল কমই হয়। এখন সবাই বৌকে মাথায় তুলে রাখে। আমাদের সময়ের কথাই আলাদা ছিল। একবার আমার সিনেমা দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। তখনই প্রথম প্রথম সিনেমার চল হয়েছিল। সিনেমা দেখা খারাপ বলে গণ্য হ'ত। তোমার মেশোমশাই-এর মতও তাই ছিল। একদিন উনি অন্য গাঁয়ে গিয়েছিলেন। দু'তিনজন সিনেমা দেখতে যাচ্ছিল, আমিও ওদের সঙ্গে গেলাম। উনি গাঁ থেকে ফিরে আমাকে না পেয়ে সোজা সিনেমা হল পর্যন্ত চলে এলেন। তখন সিনেমা সবেমাত্র শুরু হয়েছে। তুমি বিশ্বাস করতেই পারবে না মা, সবার মাঝ থেকে আমাকে উঠিয়ে আমার চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'বেশ্যার নাচ দেখতে এসেছ? বেশ্যা কোথাকার!' এভাবে মারতে মারতে আমায় বাড়ী নিয়ে এলেন। ভেতরে ঢুকে তো এত বেশী মারলেন যে, আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ভয়ের চোটে আমার অসুখ হয়ে গেল।' এসব কথা মাসীমা নির্বিকার চিত্তে বলে গেলেন। কিন্তু আমি তো রাগের চোটে কাঁপছিলাম।"

'মাসীমা এ অপমান আপনি সইতে পারলেন?'

'এতে আবার অপমানের কি আছে মা? স্বামী স্ত্রীকে বকবে না তো কাকে বকবে?'

'কাউকে না কাউকে বকতেই হবে না কি?'

'বকতেই হবে এমন কথা নয়। কিন্তু ভুল তো আমি করেই ছিলাম। আমি তো জানতামই উনি এসব পছন্দ করেন না, তবুও সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, না? রাগ ক'রে উনি যদি দু'টো থাপ্পড়ই লাগান, তাতে হয়েছে কি?' ...দেখেছো দাদা, সেকালের মেয়েদের মনোবৃত্তি?'

"আমি বলছি, 'আপনি তো কোনও ভুল করেন নি মাসীমা।'

কিন্তু উনি তাতে সায় দিচ্ছেন না। বলছেন, 'স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করাই ভুল।' দেখনা মাসীমাতে ও আমাতে কত তফাৎ। তোমার জামাইবাবুর চলমের বই পছন্দ নয়। উনি চান ওরকম বই আমি না পড়ি। কিন্তু আমি ওঁর কথা শুনি না। সামনে পড়বার সাহস নেই তাই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। এখন আসল বিপদ হলো, মেয়েরাও ভাবতে শিখে গেছে। ওদেরও নিজের আলাদা মতামত হয়েছে। মেশোমশাই-এর মত এখনও অনেকে আছেন যাঁরা স্ত্রীকে শাসনে রাখেন কিন্তু মাসীমার মত স্ত্রী আজ আর একটীও পাবে না। তাই আজকালকার জীবন না সেকালের মত, না আগের আদর্শ অনুযায়ী।''

''দু'জনের আদর্শ দু'রকম হওয়ার ফলেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যতদূর সম্ভব দু'জনের একমত হওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। এটাই তোমাদের মধ্যে হতে পারছে না...''

''আমার কোনও ভুল থাকলে আমি নিশ্চয় সেটা শোধরাবার চেষ্টা করবো।''

''আচ্ছা, আগে বলতো, তারপর সরোজা দেবীর কি হলো? আবার ফিরে আসলেন কি না?''

''তিনদিন পরেই ওঁর স্বামী ওঁকে নিয়ে এলেন। প্রাণ ছেড়ে শরীর কি থাকতে পারে?''

''তাহলে, মাসীমা এখন কেন যাচ্ছেন?''

''ব্যাপার তো এই, উনি এখন না যান তো কিছুক্ষণ পরে বৌ-ই যাবার জন্য বিছানা বাঁধবে। সংস্কার জিনিষটা জন্মগত, লেখাপড়া শিখে ওটাকে আয়ত্ত করা যায় না।''

সপ্তাহে একদিন করে ভানুর জন্য ভাল ভাল বই নিয়ে যাই, আর ওকেও গিয়ে দেখি আমি। একবার উঠোনে বসে বিট্টুকে রঙ্গীন ছবি দেখাচ্ছিলাম। ভানু জামাইবাবুকে খেতে দিচ্ছিল। মিনিট দুই বাদেই জামাইবাবুর গর্জ্জন শোনা গেল। আমি চমকে উঠলাম।

''ঘর-কন্নাতে কেন তোমার মন লাগবে? এ বাড়ীর দায়িত্ব

তোমার কিনা? জলে খানিকটা চাল সেদ্ধ ক'রে তাতেই লঙ্কা ও নুন মিশিয়ে আমার সামনে ভাত বলে ফেলে দাও। এর থেকে তো হোটেলের খাওয়াও ঢের ভালো। পেট তো ভরতে পারি। একবারও কি তুমি মন দিয়ে রান্না করেছো? এর জন্য তোমার লজ্জাও তো নেই? নিজের স্বামীকেই পেটভরে খাওয়াতে না পারো তো তোমার এখানে থাকার কিইবা দরকার? তুমি কি শুধু নিজে খাবার জন্য আর আয়েস করার জন্য এখানে রয়েছো? না, গাদাগুচ্ছের বই পড়বার জন্য? কিন্তু তোমাকে বলেই বা কি লাভ? তোমার শরীরটা এক জায়গায় আর মনটা আরেক জায়গায়। মেম সাহেব ডাক্তার হচ্ছিলেন আর কোথায় রাঁধুনীর বাজে কাজ ঘাড়ে পড়ল। যদি এখানে থাকতে না চাও, যার সঙ্গে খুশি চলে যেতে পারো।...ডর্টী, রোগ। পাগল ছিলাম আমি—শিষ্টাচার বিনয় যা কিছুই স্ত্রীর গুণ, তার কিছুই নেই তোমার...”

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ওঁর গাল দেবার কথা ভানু অবশ্য বলেছে আগে কয়েকবার কিন্তু আমি নিজের কানে এর আগে কখনও শুনিনি।...কি হতে পারে? ভানু কিছু দোষ করেছে নাকি? উনি কাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। বিট্টুকে কোলে ক'রে আমি ভেতরে গেলাম। ভানুর সামনে আধ খাওয়া ভাতের থালা। মাথা হেঁট ক'রে বসে আছে।

“কি হয়েছে?” ভানু আমার দিকে তাকাল। চোখ জলে ভরা। কিছু বলতে চাইছিল কিন্তু পারল না।

“কি হলো? তরকারী ভাল হয় নি?”

ভানু নীচু স্বরে বলল, “ভাতে নুন একটু বেশী হয়েছিল। চাল তো বেছেছিলাম, কিন্তু দু'একটা কাঁকড় বোধহয় থেকে গেছে।”

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম, “এরই জন্য এত গালাগালি? কেন, কাঁকড় বার করে আচার দিয়ে কি খেতে পারতেন না? ভুল তো সাবধানে কাজ করলেও হতে পারে। প্রত্যেক কথায়ই যদি এভাবে রাগারাগি আর বকাবকি করেন তো....”

একটু পরে ভানু বলল, "প্রথম প্রথম আমার রান্না ওঁর পচ্ছন্দ হতো না। তখন সত্যি আমি কোনো কাজ জানতাম না। আমার রান্না খেয়ে পেটও ভরত না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে আমি সব শিখে নিলাম। এখন তো সব করতে পারি। তবুও ওঁর আগের ধারণাই রয়ে গেছে। উনি ভাবেন আমার রান্না ভাল হয় না বলেই ওঁর খেয়ে তৃপ্তি হয় না। এখন কোনো দোষ দেখলেই ওঁর সেই আগেকার ধারণাই ফিরে আসে। আবার সেই গালাগাল। তা আমি কি করি বলো ?"

এ সব বিষয় আমি কিইবা জানি আর ব'লবই বা কি। চুপ করে বসে রইলাম।

"তরকারীতে নুন বেশী হওয়া তো একটা ছুতো। আসল কথাটা হলো, তুমি আমায় বই এনে দাও আর আমি তাতেই মেতে থাকি।"

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকালাম।

"কেন ? তুমি কি শোননি ওঁর গালাগাল ? তুমি কিছুই বুঝতে পারনি কি বলছিলেন ? ওঁর কথার মর্ম বুঝতে গেলে অবশ্য যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকাই দরকার।"

"ও তাই জন্যই কিছুদিন থেকে আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছেন না।"

ভানু কিছু বলল না। আমিও ভাবতে বসলাম।

"তাহলে ভানু, জামাইবাবুর যা পছন্দ নয় তা কি আমার করা উচিত ? এভাবে আমার বই আনা...তুমি নিজেই ভেবে দেখ... ।"

"আমার পেট ভরে খাওয়াও তো ওঁর পছন্দ নয় দাদা ! কতবার বিদ্রুপ করেছেন, আমি খেয়ে দেয়ে আরামে ঘুমোই বলে। তাহলে, খাওয়া, ঘুম সব ছেড়ে দেব ? আমি কোনও অন্যায় কাজ তো করছি না। বই পড়াও তো আমার পক্ষে একরকম খাওয়া। বই পড়লে আমার মন হাল্কা হয়, শান্তিও পাই। তুমি নিজে যদি বই আনতে না চাও তো সে অবশ্য আলাদা কথা...আমি আর কি বলবো ?"

"আচ্ছা বেশ। আমি তো এনে দেব। কিন্তু তোমায় বই পড়তে জামাইবাবু যেন দেখতে না পান এটি মনে রাখবে।"

ম্লান হেসে ভানু বলল, "কিরকম চোরের মত থাকতে হয়।"

হঠাৎ জামাইবাবুর একটি কথা মনে ভাসাতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা, ডাক্তারী নিয়ে উনি কি বলছিলেন ?"

"ওর ঠাট্টা, বিদ্রূপের কথা তোমায় কি বলবো ? একবার খুব উৎসাহ ক'রে বলে ফেলেছিলাম, 'কলেজে ভর্তি হলে এতোদিনে আমি ডাক্তার হয়ে যেতাম।' ঐ কথা নিয়ে কতোবার খোঁটা দিয়েছেন। খুশির চোটে যদি কোনও কথা বলে ফেলি, তাই নিয়ে এভাবে খোঁটা দেন তো ওঁর সঙ্গে খোলাখুলি কথা কি করে বলতে পারি ? অনেকক্ষণ আমরা নিঃশব্দে বসে রইলাম।

তারপর ভানু উঠে গিয়ে থালা নিয়ে এল। হঠাৎ ওর কিছু মনে পড়ে গেল। বললে, "তোমায় বোধহয় বলা হয়নি, মাসীমার মেয়েটি মারা গেছে।"

"মারা গেছে ?" আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

"হ্যাঁ, মাসীমার কাছে যাবার আমার সাহস হয় নি। ওঁর একটাই আশ্রয় ছিল সেটিও গেল। দশ দিন হয়ে গেছে।"

"কি অসুখ হয়েছিল ?"

"অসুখ, কিছুই ছিল না। বরাবর প্রসব হবার কিছু আগে থেকেই ও ব্যথায় ভুগতো। তিনটে ছেলেমেয়ে হতে ওকে খুব কষ্ট পেতে হয়েছিল। ডাক্তার স্পষ্টই বলে দিয়েছিলেন আবার যদি ছেলেপিলে হয় তো 'মা'র প্রাণের আশঙ্কা। তবুও ওঁর স্বামী অপারেশনের কথা পর্যন্ত ভাবেন নি। ওঁর নিজের তো প্রাণ যাচ্ছে না। এবার ছেলে হতে গিয়ে বেচারী নিজেই শেষ হয়ে গেল। যাক্, ওঁর আর কিসের ভাবনা। এবার আরও সুন্দর স্ত্রী পাবেন।"

"তোমারও যেমন কথা ভানু ! উনি বোধহয় ভাবতেও পারেন নি, এত শীগগির এসব ঘটে যাবে। উনি এ সব বোঝেনই নি।"

"নিজের বেলায় বুঝতেন না ?"

"উনি বোকা যে, বুঝতে নাও পারেন। অনেকেই এসব হয়ে যাওয়ার পর পস্তায়।"

"তোমার এ যুক্তি আমি সমর্থন করি না—যেমন তুমি বলছো, যে, ওঁর ভয় ছিলনা, ওঁর স্ত্রী মারা যেতে পারে সে কথা উনি ভাবতেই পারেন নি, ভাবলে উনি তাকে বাঁচাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন।"

একটু ভাববার পর আমিও বুঝতে পারলাম। "নিজের সবাইকে ছেড়ে দিয়ে যে স্ত্রী স্বামীকে তার যথাসর্বস্ব দান করে, তাকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার মত পুরুষ আছে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যদিকে এমন মেয়েরও অভাব নেই, যে স্বামীকে বিষ দেয়। কি একটা গল্পে পড়েছিলাম, স্বামীর নামে অনেক টাকার বীমা করিয়ে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করবার চেষ্টাও করেছে। যদিও এরকম খুব কমই হয়। তবুও এ বিষয় কিছু ঠিক ক'রে বলতে পারা যায় না, কার দোষ বেশী? দোষটা হলো ব্যক্তি বিশেষের, স্ত্রীজাতিরও নয়, পুরুষ জাতিরও নয়।"

"পুরুষ যা করলো তা স্ত্রী করলো কি না, প্রশ্ন এ নয়। প্রশ্নটা হল, যে স্ত্রী স্বামীকে উপেক্ষা করে তাকে সংসারের সবাই খারাপ ভাবে। কিন্তু স্বামী যদি তাই করে তাকে কেউ শাস্তি দিতে যায় না। এটা কেন হয়? ভগবানের ইচ্ছে! নয়তো স্ত্রীর দুর্ভাগ্য! পুরুষ সবসময়ই সমাজে মাথা উঁচু করে থাকে। শাস্তি সমানই হওয়া উচিত, অপরাধ পুরুষ, স্ত্রী যারই হোক না কেন।"

"আচ্ছা যথেষ্ঠ হয়েছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে হলে প্রচুর ধৈর্য্যের দরকার। আমি একটা কথা বলছি, শোন। সমস্ত জগতকে তো তুমি ঠিক পথে আনতে পারবে না। নিজের পরিবারকেও শোধরাতে পারবে না। পদ্মের পাতার উপর জল যেমন থাকে সেরকম আমাদের নির্লিপ্ত থাকা উচিত। সর্বদা সববিষয় বেশী ভাবতে গেলে শুধু সমস্যাই বাড়ে, তার সমাধান কিছু হয় না—অতএব অকারণ মাথা খারাপ করায় কি লাভ? নির্লিপ্ত থেকে

সংসার যেমন চলছে চলতে দাও। ওর সঙ্গে তুমিও চল, আমিও চলি। সংসার তো তোমার কথায় চলবে না।”

ভানু হেসে বলল, “কবে থেকে আপনি এমন বেদান্তী হলেন ?”

“আজ্ঞে . . . এক্ষুণি . . . তাহ’লে আমায় গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।” বলে আমিও হেসে ফেললাম।

“নিশ্চয়ই ! এর বেশী আমার কি চাই ? এবার ভাবনা চিন্তা থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায় আমায় বলে দিন।”

“শিবোহম্। এবার আনুন এক ডজন কলা . . . কর্পূর . . . নারকল . . .”

চার পাঁচ সপ্তাহ মন্দ কাটল না। সামান্য কিছু নিশ্চয়ই হয়ে থাকবে কিন্তু ভানু চেপে গিয়েছিল—মান থাকবে না বলে। কিন্তু কখনও কখনও আমি লক্ষ্য করতাম জামাইবাবু যেন আমার প্রতি উদাসীন। কথাও বিশেষ বলতেন না। তবে কোনও অশান্তি ছিল না। আশঙ্কা হতে লাগল এটা ঝড় ওঠার আগেকার চিহ্ন না তো ? একবার ভানুর কলমের নিব ভেঙ্গে গিয়েছিল, আমায় সারাতে দিল। এক সপ্তাহ নিশ্চেষ্ট থেকে শেষে একটা ভাল নিব লাগিয়েই আনলাম। ভানু খেজুর ভালবাসে। দু’সের খেজুর, কিছু ফুল আর বিট্টুর জন্য বিস্কুট নিয়ে নতুন থলিতে ভরে নতুন কেনা সাইকেলে চড়ে বেরুলাম।

বাইরের দরজা ভেজান ছিল। কেন জানিনা, হঠাৎ বড় ভয় করতে লাগল। জামাইবাবুর চীৎকার কানে এল। উনি চেঁচিয়ে বলছিলেন, “ইদানীং তোমার অহঙ্কার খুব বেড়েছে। তোমার এ ব্যবহারের কারণ আমি খুব ভালো করেই জানি। ঘর দোর, স্বামী, পরিবার এসবের জন্য তুমি কেন মাথা ঘামাতে যাবে ?”

সাইকেল বাইরে রেখে আমি চাতালের কাছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লাম।

“তোমার দরকারের সব জিনিস ‘সাপ্লাই’ করবার লোক যখন

রয়েছে, তখন বাড়ীর কর্তার ভাবনা ভাবতে কি দায় তোমার? আমাকে দেখাশোনা করবে কেন? খানকী কোথাকার!"

আমি তো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কি নোঙরা কথাই বলছে। ইঙ্গিত তো আমাকেই করছে। এবার তাহলে এখানে আসা যাওয়া বন্ধ করি . . . ? আবার চীৎকার উঠল। "কতবার বলেছি সাবধানে থাক, তোমার ডাক্তারীর কথা ছাড়ো। আর কবে তুমি এসব বুঝবে? কেন তুমি কিছু দেখতে পাও না? বেপরোয়া হয়েই চলেছ। গৃহিণীর কোনো গুণই নেই তোমার। তোমাকে বিয়ে করাটাই আমার অভিশাপ। আসলে তোমার বাবা তোমার বিয়েই বা কেন দিলেন, উনিই জানেন।"

আমি রাগের চোটে ঠোঁট কামড়াতে লাগলাম। আজকালকার স্বামী যত নীচই হোক এভাবে স্ত্রীকে গালাগালি দেয় না। "বয়স থাকতে বিয়ে হতো তো এতদিনে চার ছেলের মা হয়ে যেতে। খাইয়ে দাইয়ে ধিঙ্গি করে তোমায় আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। আমিও কেমন অন্ধের মত এই ফাঁদে পা দিলাম। আমারই কপাল মন্দ তা দোষ দেব কাকে? স্ত্রী বলেই তোমাকে ক্ষমা ক'রে যাচ্ছি। কিন্তু আমি যতই নরম হচ্ছি, তোমার ততই আসকারা বাড়ছে। দু'থাপ্পড় লাগিয়ে বার ক'রে দেব তো টের পাবে। আমায় কে আটকাবে— তোমার বাপ না ভাই . . . ?"

"বদমাশ!" রাগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। হাত নিশপিশ করতে লাগল, দাঁত কিড়মিড় ক'রে উঠল। "রাসকেল! থাপ্পড় তোমার গালে পড়লে বুঝবে। দেখি তোমার কোন বাপ আমাকে আটকাতে আসছে।" ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল, এগিয়ে গেলাম।

এক মিনিটেই . . .

"দাড়াও", কেউ যেন আমায় থামিয়ে দিল। "তাড়াহুড়ো করো না," মন শাসিয়ে উঠলো . . .

নিজেকে সামলে নিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম।

তাড়াহুড়োতে কিছু করে ফেলা ঠিক নয়। এটা রাগারাগি করবার সময় নয়। ভানুকে এখনই নিয়ে আসা ঠিক হবে না। এখন এ বন্ধনই ওর জন্য শ্রেয়ঃ।

নিজেকে সংযত ক'রে নিলাম। এক মুহূর্ত অমনিই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, ফিরে যাই। কিন্তু জানিনা ভানু কত কষ্টই পাচ্ছে। ওকে একবার সান্তনা দিয়ে য'ওয়া . . .

দরজা খুলে ময়লা কাপড়ের পোঁটলা নিয়ে কেউ বেরুল। বোধহয় ধোপা। আমি আরও আশ্চর্য হলাম। ও আমার দিকে চেয়েই মাথা নীচু করে চলে গেল। ধোপার সামনে কোনও শিক্ষিত লোক স্ত্রীকে এভাবে গালাগালি দিতে পারে, না দেখলে কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না। কোন সভ্য লোকই এতো নোংরা কথা, এমন নিলর্জ্জ হয়ে বলতে পারে না। স্ত্রী কত ভালোই হোক তাকে এসব চুপচাপ সহ্য করতে হবে—কি বিড়ম্বনা।

সে সময় আমি শুধু একটা কথাই ভাবছিলাম। হায় ভগবান, কেন আমায় ও ভানুকে নিজের ভাইবোন করেন নি। আমি যদি ভানুর নিজের ভাই হতাম তো আমার একটা বিশেষ অধিকার থাকতো, আমার আরও শক্তি হত, আরও কিছু করতে পারতাম। ও ব্যাটাকে লাথি মেরে শেষ করে দিতাম, আর বোনকে বাড়ী নিয়ে গিয়ে মার হাতে তুলে দিতাম। মাকে বলতাম, ওকে নরক থেকে উদ্ধার করে এনেছি। কিন্তু . . . কিন্তু . . . আমি তো ভানুর আপন ভাই নই। ওকে বাঁচাবার আমার কোন অধিকারই নেই। এ ব্যাপারে আমার হস্তক্ষেপ না করাই ভালো।

ভাবলাম, যাই ফিরেই যাই। কিন্তু অন্যমনস্ক হয়ে কখন যে বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি বুঝতে পারি নি। 'জামাই বাবু' . . . বলতে গিয়েই মনে হল, ওঁকে আবার জামাইবাবু বলে ডাকবো? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে উনি চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ আমাকে দেখেই একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, কিন্তু তক্ষুণি নিজেকে সামলে নিলেন।

"ও, এসেছেন আপনি ! ভালোই হল। দেখেছেন কি কাণ্ড করেছেন আপনার আদুরে বোনটি। উনিতো বুদ্ধির বৃহস্পতি কিনা।"

রাগে আমার গা রী-রী ক'রে উঠল। বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই বোনের নামে নালিশ।

রাগ চেপে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি আবার হলো ?"

"মস্ত কাজ করেছে। আপনি সব শুনে ওর প্রশংসা করলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে।"

ওঁর কথা বলার ধরন দেখে আমার গা জ্বলে গেল।

"এঁর তো চোখ থাকতেও চোখ নেই। আর ধোপা ব্যাটাও একেবারে অন্ধ। এই নূতন প্যাণ্টটা পরে কাল পার্টিতে গিয়েছিলাম। বাড়ী এসে ওটা ছেড়ে আলনায় রেখে ছিলাম। দুপুরবেলা ঘুম থেকে উঠেই ধোপার পোঁটলাতে প্যাণ্টটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ধোপা প্যাণ্টটাকে পোঁটলায় বাঁধছিল আর তোমার বোন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। প্যাণ্টটা যে একেবারে পরিষ্কার ছিল সেটা কি ওর চোখে পড়ছিল না ?"

আমি তো হতবাক ! লোকটা কেমন ? এই সামান্য জিনিসে . . .

"কি রাও সাহেব ! কিছু বলছেন না যে ?"

"বলবো আর কি ! আপনারই উচিত ছিল ওটা আলনায় না রেখে হ্যাঙ্গারে টাঙিয়ে রাখা"।

"বাঃ বাঃ, উচিত অনুচিত বলে বোনের পক্ষ নেবেন না। অমন কাজ কখনও করবেন না। আমি নিজের ইচ্ছেমত কাজ করি বলে কি সেও তাই করবে ?"

"জামাইবাবু, প্রত্যেক কথায় আপনি দোষ ধরবেন না। এতে ইচ্ছে অনিচ্ছের কি আছে ? আপনার এখানে ময়লা কাপড়গুলো আলনাতেই রাখা হয়, তাই প্যাণ্টটা ওর সঙ্গে ধোপার বাড়ী চলেই যেতে পারে। অবশ্য ভাল করে দেখলে আর এ ভুল হতো না।"

"বিলক্ষণ! কিন্তু ওর ভালো করে দেখার দরকারটা কি?"

"দরকার নেই এমন কথা বলবেন না। ভুল তো সকলেরই হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে তো কেচে এসেই যেত—ছ'আনা আর বেশী খরচ হত। শুধু এই না? এইটুকুর জন্য ধোপার সামনে অশ্লীল গালি পাড়বার কি দরকার ছিল? এতে অপমানটা কার? এ বিষয় কখনও ভেবেছেন?

উনি যেন ছটফটিয়ে উঠলেন, ওঁর গালাগালি সব আমি শুনেছি বোধহয় বুঝেছেন। আমি আবার ঐ কথাই বললাম, "পরিষ্কার কাপড় ময়লা কাপড়ের সঙ্গে কাচতে দেওয়া কি এমনই অমার্জণীয় অপরাধ?"

মুখ ভেঙচিয়ে বললেন, "ভুল করে ক্ষমা চাওয়া আমার একটুও পছন্দ নয়। এ সামান্য কাজটুকুও যদি না করতে পারে তো লজ্জা হওয়া উচিত।"

"তা ঠিক। কিন্তু ভুল দেখানোরও কায়দা থাকা চাই।"

"বটে! তার মানে আপনার মুখে গালাগালিতেও বোধহয় ফুল ঝরে।"

"বকুনী খেয়ে কারুর আনন্দ হতে পারে না। কিন্তু তা এত সাংঘাতিক হলে, অন্যের মনে আঘাত লাগাতে পারে তো? যা মুখে আসে তাই আপনি বলে যান, তাতে ভানুর কত দুঃখ হয়, কখনও ভেবেছেন কি?"

"ভাববার কোনও দরকার নেই। আত্মসম্মান-জ্ঞান যদি এতই তো বোনের বিয়ে না দিয়ে বাড়ীতে বসিয়ে রাখলেই পারতেন।"

"আপনি কি বলতে চান? বিয়েথার পর কোনো মেয়েই কি তার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না?"

উনি হো হো ক'রে হেসে উঠলেন। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

"উঃ, কি ব্যক্তিত্ব বজায় রাখা! পরের উপর যে নির্ভর তারও আবার ব্যক্তিত্ব! কি কথাই বললেন? নিজের পেট ভরবারও মুরোদ যার নেই, তার আবার ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, আদর্শ..."

নির্বাক হয়ে গেলাম আমি। উনি বলেই চললেন, "পরিবারের দেখাশোনা, রক্ষণাবেক্ষণ, শাসন সব গৃহস্বামীর হাতে। এসব কাজ মেয়েমানুষে পারে? আপনিই বলুন। প্রকৃতিই মেয়েদের দাবিয়ে রেখেছে। তবে, ওকে স্বাধীনতা কে দিতে পারে? মেয়েদের স্বতন্ত্রতা, ব্যক্তিত্ব, প্রগতি এসব বিষয় লেকচার দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। পুরুষের যদি কোনো বৈশিষ্ট্যই না থাকে তো স্ত্রী-পুরুষে তফাৎ কি রইল? যাক্‌গে, আপনিও নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিত্বকে কেমন ক'রে বজায় রাখবেন তা দেখে নেব।"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে রইলাম। এবার আমার মাথায় ঢুকেছে। ভানু যতই প্রগতির পক্ষে, রাজ শেখরম ততই বিপক্ষে, একেবারে গোঁড়া। এত বেশী ভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে বিয়ে হলে দুঃখ অনিবার্য। ভানুর কোমল হৃদয় কিভাবে নিষ্পেষিত হচ্ছে। কিন্তু তার কোনও চারা নেই।

ওঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করে ওঁকে বোঝাবার জন্য আমি খুবই ব্যাগ্র হয়ে উঠলাম। কিন্তু এ নির্বোধকে বোঝানো আমার সাধ্য নয়।

উনি চলে গেলেন। দরজা বন্ধ করে ভেতরে গেলাম। রান্না-ঘরের সামনে হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসেছিল ভানু। আমি আস্তে আস্তে গিয়ে ওর মাথায় হাত রাখলাম। ও চোখ তুলে চাইল। লাল, লাল, ফুলো, ফুলো চোখ। তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে নিল। আমারও চোখে জল এসে গেল। এবার আমি ওকে কোনো সান্ত্বনা, আশ্বাস, প্রবোধ দিতে পারলাম না। চুপচাপ ওর পাশে বসে পড়লাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি রাগে জ্বলেপুড়ে মরছিলাম। শেষে প্রায় চীৎকার ক'রে উঠলাম—"তুমি মুখে তালাচাবি এঁটে রইলে কেন? কোনও জবাব দিতে পারতে না? এরকম অসভ্য লোকের সঙ্গে মিষ্টি কথা বলে কি কোনও লাভ আছে?"

চোখ মুছতে মুছতে ভানু বলল, "তুমি কি চাও, ধোপার সামনে আমি মারও খাই?"

"তা ঠিক বলেছ। এরকম সময় ওঁকে কেউ বাধা দিতে গেলে, উনি সব রকম কুকর্মই করতে পারেন।"

"প্রত্যেক কথারই জবাব দিয়ে যদি ওঁর মুখ বন্ধ করতে পারতাম তো আজ আমার এ অবস্থা হত না।"

কিছুক্ষণ পরে আমি আবার বললাম. "কিন্তু ভানু, উনি কথায় কথায় কেন এত রেগে ওঠেন?" ভানু তখনই জবাব দিল না। পরে বলল, "হ্যাঁ, কথায় কথায়ই বটে। কিন্তু এর গৌরচন্দ্রিকা সকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কাল সন্ধ্যাবেলা কোনও একটা পার্টিতে গিয়ে কলমটা হারিয়ে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, ওঁর কোনো বন্ধুই সরিয়ে থাকবে ওটা। পঞ্চাশ টাকার কলম।"

"সত্যি হারিয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, যেটা তুমি ওঁকে বিয়েতে দিয়েছিলে। অফিস যাবার আগে আমার কলমটা চাইলেন, তাইতে বলতে হল, ওটায় নিব লাগাবার জন্য তোমায় দিয়েছি। ব্যস্ আর যাবেন কোথা, আরম্ভ হয়ে গেল ঝগড়া। তোমায় আমায় নিয়ে গালাগাল পাড়তে লাগলেন। বললেন, আমি একটা পাতান ভাই পেয়েছি, যাকে পেয়ে ওঁকে অগ্রাহ্য করছি, একেবারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছি। বললেন, 'কলমটা সারাতে আমায় দাওনি কেন? আমি কি নিব লাগিয়ে আনতে পারতাম না? তুমি কি আমাকে এতই অপদার্থ ভাবো? তোমরা দু'জনে মিলে কি আমায় পাগল করে ছাড়বে? আমাকে হেনস্থা করে ওকে দিয়েই সব কাজ করাবে? উনিই তোমাকে খাওয়াবেন, পরাবেন না কি? এইভাবে কথা বেড়েই চলল। ওঁকে কলম সারাবার কথাটা না বলা আমার অন্যায় হয়েছে, এই ওঁর নালিশ। কিছু ভুল করলে আমি সর্বদাই স্বীকার ক'রে নিই। কলমের বিষয় কেন ওঁকে বলিনি তার কারণ ওঁকে সবিস্তারে বোঝালাম—'তোমাকে যখনই কিছু করতে বলেছি তুমি গ্রাহ্য করো নি। লাইব্রেরী থেকে বই আনতে বললে এনে দাও নি। রঙীন সূতো কিনে দিতে বলেছিলাম তা কিনে দিলে না।

চিঠি লেখবার একটা পোষ্টকার্ডও নেই বললে কথা উড়িয়ে দিলে। তবে কলম সারাবার কথা আমি কোন ভরসায় বলতাম ? যখন জানিই, তুমি এসব করে দেবে না তো ভাইকে বললে দোষটা কি হল ?'

'তর্ক করো না।...রাসকেল ! কি একটা যা তা স্কুলে তো পড়েছেন তারই অহঙ্কারে গেলেন—আমার সঙ্গে তাল দিয়ে বড় বড় বুলি আওড়াচ্ছেন। আমি যা খুশি তাই করবো, তোমার হুকুমে চলব না। এত অহঙ্কার কিসের ? তুমি কি মহারাণী যে তোমায় কুর্ণিশ ক'রে তোমার বান্দা হয়ে থাকব ?'

'মহারাণী আমি কোত্থেকে হব ? মহারাণী হলে তোমার সামনে এরকম মাথা হেঁট করতে হত ? কিন্তু মহারাণী কি তোমার কাছে তোমার স্ত্রীর থেকেও বড় ?'

আমি রেগে বললাম, ''তোমার বলা উচিত ছিল, তুমি মহারাজা হলে আমিও মহারাণী হতাম।"

"এভাবে কথা বাড়িয়ে কি লাভ ? খারাপ লাগলে আমি নিরুত্তর হয়ে মাথা নীচু করে থাকি।"

'ভানুমতী দেবী, মনে রেখো ! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ। আমি তোমার স্বামী, ভৃত্য নয়। বুঝলে ?' এইরকম কটাক্ষ, উপহাস, ব্যঙ্গ চলতে লাগল। 'একি নাটক করছ...এ আমি...আমি আর সহ্য করব না।' বলতে বলতে আমি কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই থামছিল না আমার কান্না, কিন্তু এরি মধ্যে বিট্টু খেলা শেষ করে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। বিট্টুর ছোট হাত ছুটো দিয়ে আমার চোখের জল মুছে দিয়ে আমি...."

"বুঝেছি ভানু ! এবার আমার এখানে আসা-যাওয়া বন্ধ করা উচিত।"

"দাদা, তুমি আর না এলে আমি আর বিট্টু..."

"তোমার দুঃখে সান্ত্বনা দেবারও অধিকার আমার গেল।" বলে আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

অনেকক্ষণ ধরে আমরা চুপচাপ বসে রইলাম।

"আচ্ছা, এবার গিয়ে মুখহাত ধুয়ে এসো। এসব কথা ছাড়ো।" ভানু উঠে গেল। থলি থেকে সব জিনিষ বার ক'রে এক এক করে পিঁড়ির উপর রাখলাম। এতক্ষণ বিট্টু এরই অপেক্ষায় ছিল। বিস্কুটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

পেছন থেকে আমার ডাক শুনে বলল, "এখুনি এসে যাবো মামাবাবু", আর পালিয়ে গেল।

ভানু ভাত বেড়ে বলল, "শয়তান ছেলে, খুব কথা বলতে শিখেছে, না?" আমি ভানুর কাছেই বসে পড়লাম। নিম্নস্বরে ডাকলাম, "ভানু"।

ভানু চোখ তুলে তাকাল।

"কিছু মনে না করো তো একটা কথা বলি। একটু আগেই জামাইবাবুর গালাগাল শুনে কিন্তু আমি ভীষণ রেগে গিয়েছিলাম। মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গিয়েছিল—তখুণি ইচ্ছে করলো ওঁকে দু'থাপ্পড় লাগাই। জানিনা, কি ক'রে সে রাগ সংবরণ করলাম।"

ভানু আশ্চর্য হয়ে গেল। "কত বড় ভুল ক'রে বসতে তাহলে দাদা। তার পরিণাম যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কেউ বলতে পারে না। সারাজীবন আক্ষেপ রয়ে যেত। স্বপ্নেও এরকম ভেবো না আর। বড় লজ্জার বিষয় এটা। থাক্‌গে...যে যেমন করবে তেমন ফল পাবে। স্বামী, স্ত্রী হোক বা ছেলে মাই হোক, পাপী নিজেই তার পাপের ফল ভুগবে। শাস্তি দেবার অধিকার ভগবানের, আমাদের নয়। তোমার জামাইবাবুর উপর খুব ঘেন্না ধরে গেছে, না?"

"না, না। রাগ তো নিশ্চয় খুবই হয়েছিল। কিন্তু...কিছু মনে করো না," আমি লজ্জিত হলাম।

ভানুকে ওভাবে খেতে দেখে আমার খুব কষ্ট হল। স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করছে বলে যার স্বামী সব সময় খোঁটা দিয়ে থাকে তার সঙ্গে সারাজীবন কাটানো যে কি দুর্বিসহ সেই চিন্তা আমায়

ব্যথিত করছিল। হঠাৎ চোখ তুলে দেখি ভানু একদৃষ্টে আমার দিকেই চেয়ে আছে। আমি ধরা পড়ে গেলাম।

সে বললে, "কারুর দয়ার অন্নে আর আমি কতদিন বাঁচতে পারব দাদা?"

আমি জবাব দিলাম না।

"আজ সকাল থেকেই খাওয়ার ইচ্ছে নেই। এখনও খেতে ভাল লাগছে না," বলে জলের গেলাস তুলে নিল।

"একি করছো?...ভানু!" আমি বলবো কি, তার আগেই ও হাত ধুয়ে ফেলল। "ঠিক আছে দাদা, কাল সকাল থেকে আবার দাসীর কাজে লাগবার জন্য এই যথেষ্ট।

কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ ভানু জিজ্ঞাসা করল, "লক্ষ্মী পিসিমার কথা তুমি জান দাদা?"

"আমি বিশেষ কিছু জানি না। ভগবানের কাছে মানত ক'রে যিনি মারা গিয়েছিলেন, সেই পিসিমা, না?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ উনিই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে অসুখ হয়ে যিনি মারা গিয়েছিলেন। খুবই ভাগ্যবতী ছিলেন।

"রাত্তিরে ঘুমোবার আগে ঠাকুরমার কাছে পিসিমার অনেক গল্প শুনেছি। শুনতে শুনতে যেন কেমন এক নেশায় ডুবে যেতাম।"

"পিসিমার কথা তুমিই বোধহয় বেশী জানো—শ্বশুরবাড়ীতে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন শুনেছি।"

"অসহ্য কষ্ট গেছে পিসিমার। যা শুনেছি ওঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। ওঁর কথা বলতে গিয়ে ঠাকুরমা কেঁদে ফেলতেন। বড়দের মত আমি ওঁর চোখ মুছিয়ে সান্ত্বনা দিতাম। ঠাকুরমা আমায় খুব ভালবাসতেন। বলতেন, আমার চেহারা একেবারে পিসিমার মত, আমাকে দেখলেই পিসিমাকে মনে পড়ত।"

"পিসিমা বাপমায়ের একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাই খুব আদরে

মানুষ হয়েছিলেন। কাছাকাছি কোনো গাঁয়ে বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে ওঁর বিয়ে হয়েছিল। ঠাকুরমা যখন পিসিমাকে সুন্দরী বলতেন, মনে হত বাড়িয়ে বলছেন, কিন্তু রূপসী উনি বাস্তবিকই ছিলেন। কাঁচা সোনার রঙ তাঁর, সুগঠিত দেহ, দেখলে দেবী প্রতিমা মনে হত। কালো কুচকুচে চুলের ঢালকে বিনুনী বাঁধবার সময় পেতেন না বলে এলোচুল জড়িয়ে নিতেন একটা খোঁপায়। কালো মেঘবরণ চুলের মাঝে ওঁর সুন্দর মুখখানা যেন চাঁদের মত ফুটে উঠত। আয়তনেত্রে উনি যখন তাকাতেন, ছটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল বলে ভুল হত। ওঁর ওষ্ঠ তাম্বুল রঞ্জিত, কি সহজ লালিমায় রক্তিম বোঝা কঠিন ছিল। পায়ের নখ পদ্মপাতার মত মসৃণ। ফাঁপানো রুক্ষ চুলের ছায়া পড়ে থাকত ওঁর কপোলে। চন্দ্রমাকে মলিন করে দেয় এমন ছিল ওঁর সৌন্দর্য। পিসিমা অপূর্ব সৌন্দর্যের নিধি ছিলেন। তাঁর সোনার অঙ্গে গাঢ় রঙের শাড়ী পরে খোঁপায় ফুল গুঁজে, আরতির থালা নিয়ে রোজ সকালে মন্দিরে যেতেন। সন্ধ্যাবেলা ওঁর সুমধুর কণ্ঠে ভাগবত কীর্তন শুনে সবাই আত্মহারা হয়ে যেত।”

“স্বর্গের দেবীই ছিলেন পিসিমা। কিন্তু অভিশপ্ত দেবী।”

“রূপে লক্ষ্মী হয়েও ছিলেন ভাগ্যহীনা।”

“পিশেমশাই পিসিমার দিকে কখনও চেয়েও দেখেন নি। বিয়ে হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিসিমার জীবনের সব আনন্দ ফুরিয়ে গেল। নতুন বৌ হয়ে এসেই যেন নরককুণ্ডে পা দিলেন।

“পিশেমশাই একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক। ওঁর আশা-আকাঙ্খা সব আলাদা রকমের। অনেক কু-অভ্যাস ছিল ওঁর। ঠাকুরদা যে এসব জানতেন না, তা নয়। জানতেন, বেশ ভালভাবেই জানতেন—কিন্তু সে সময়ই ছিল আলাদা। সে সময়ের লোকও আলাদা রকম। পুরুষের পক্ষে অকরণীয় কিছুই ছিল না। পুরুষকে কোনও জিনিষই অপবিত্র করতে পারে না। সুতরাং পিসিমাকে একটা চরিত্রহীনের ঘর করতে হল।”

"কিন্তু পিশেমশাই এর নেশা কাটল না পিসিমার রূপ মাঠে মারা গেল।"

"রাত্তির হলেই পিশেমশাই মিলের ধোওয়া ফর্সা কাপড় পরে, আলপাকার কোটের উপর জরির চাপকান চড়িয়ে, মাথায় ফুলেল তেল মেখে কেশবিন্যাস ক'রে, সুগন্ধি পান চিবুতে চিবুতে, পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচটা ঝকমকে আঙটি পরে, হাতে চকচকে রূপোর ছড়ি নিয়ে, বিলিতি চটির আওয়াজ তুলে সগর্বে বেরিয়ে পড়তেন— কোথায় ? বেশ্যাবাড়ী ! বড় উৎসাহ ক'রে নিজের সর্বস্ব বেশ্যাদের দিয়ে ঠিক ভোর হবার আগে বাড়ী ফিরতেন। অবিন্যস্ত বেশ বিন্যাস, গলায় ঝুলোনো বেশ্যাবাড়ীর শুকনো ফুলের মালা, আরও অনেক কিছুর সুগন্ধ ছড়াতে ছড়াতে হাজির হতেন। বাইরেই পালঙ্কের উপর তোষক বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।"

"নিজের কপাল মন্দ বলে পিসিমা দুঃখ পেতেন বা এসব তাঁর খারাপ লাগত কিছুই উনি তাঁর নিজের মাকে পর্যন্ত জানতে দেন নি। সমস্ত বেদনা মৃদু হাসিতে ঢেকে রাখতেন। সাহস ক'রে কোনও দিন উনি যদি স্বামীর ঘরে ঢুকতেন, তখন যা কাণ্ড ঘটতো তার সাক্ষ্য ওঁর গালের কালো দাগগুলো। ওঁর গালে কালশিটের দাগ বেশ কিছুদিন থেকে যেত। এটাই ছিল পিসিমার দাম্পত্য সুখের পরিসমাপ্তি।"

"এবার শ্বশুর বাড়ীর কথা শোন...তখনকার দিনে শাশুড়ীর সঙ্গে বৌ থাকার মানে, বৌ সারাক্ষণ ভয়ে কেঁচোটি হয়ে থাকবে। ওঁর শাশুড়ী খুব বদরাগী ও অত্যাচারী ছিলেন। দিনে একবারও পেট ভরে খেতে পেতেন না পিসিমা। মাসে দুবারও মাথায় তেল লাগাতে পারতেন না। পূজপাঠে খুব মন ছিল পিসিমার। কিন্তু শ্বশুরবাড়ী এসে অবধি পূজা করার সময়ই পান নি। ঘরকন্নার কাজেই সারাদিন খেটে মরতেন। শুধু বৌকে খাটিয়ে মারবার জন্যই শাশুড়ী অনর্থক কাজ করাতেন। ছেলে বাড়ী ফিরলেই বৌ এর নামে নালিশ করতেন। যার ফলে—পিসিমার শাস্তি। মাসিকের

সময় পিসিমা একমুঠো খেতে পেতেন না। শাশুড়ী বলতেন, সব বৌদের ছেলেপিলে হচ্ছে, তুমিই শুধু পেট ভরে খেয়ে অমনি বসে আছ। বাঁজা বৌকে খাইয়ে কি হবে? এই বলে ধমকে ধামকে সারাদিন উপোসী রাখতেন। বাড়ীতে খাট পালঙ্ক যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও পিসিমাকে মাটিতেই শুতে হত। বাড়ীতে দুধ দই-এর অভাব ছিল না কিন্তু পিসিমার ভাগ্যে ফ্যান।

"পিসিমাকে কেউ সম্মান করতো না, আপনও ভাবত না। তবুও তাঁর দুঃখের কাহিনী উনি নিজের মাকেও কখনও শোনান নি। অন্য কারুর মুখে ঠাকুরমা পিসিমার কথা জানতে পারলে বড় কষ্ট পেতেন। পিসিমাকে দেখতে যখন ওঁদের গাঁয়ে যেতেন, বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড়াতেই বেয়ান গিন্নী তিক্তস্বরে বলতেন, 'কি গো, মেয়ে তোমার আমাদের ঘরে কত কষ্টে আছে তাই দেখতে এসেছ?' ঠাকুরমা রাগ চেপে বলতেন, 'আরে, সে কি কথা? ওর এখানে কষ্ট কিসের? এমনি দেখতে ইচ্ছে হল তাই...' মাঝ-পথেই ঠাকুরমাকে থামিয়ে দিয়ে বেয়ান বলতেন, 'ঢের হয়েছে, আর কিছু বলার দরকার নেই। পৃথিবীতে মেয়ে শুধু আপনার ঘরেই জন্মেছে? ও কি কচি খুকী, যে দৌড়ে দৌড়ে দেখতে আসতে হয়?'

"ঠাকুরমা উত্তর দিতেন না। উত্তর দিলে তো মেয়ের বছরে একবার আসা যাওয়াটাও বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ ঠাকুরমা ওখানে থাকতেন, ওঁর বেয়ানও ওঁর কাছে পিঠেই লেগে থাকতেন। ঠাকুরমা কোন কথা বলারই সুযোগ পেতেন না। মেয়েকে শুধু চোখের দেখা দেখে তখনই গাড়ী ক'রে ফিরে আসতেন। বেয়ান বাড়ীতে কেউ খেতেও বলত না।

"বছরে একবার কোনও পর্বের ছুতোয় পিসিমা যখন মার কাছে আসতেন, সেদিনটা ঠাকুরমার আর ঠাকুরদার একটা উৎসবের দিন হয়ে দাঁড়াত।

"একবার সন্ধ্যাবেলায় যখন ঠাকুরদা ক্ষেতে ছিলেন, হঠাৎ

মেয়েকে দেখার ওঁর ভীষণ ইচ্ছে হলো। তক্ষুণি কাঁধের উপর চাপকান ফেলে ছড়ি হাতে পিসিমার শ্বশুরবাড়ীর দিকে রওনা হলেন।”

“বাড়ী পৌছুতে অন্ধকার হয়ে গেল। জামাই বৈঠকখানায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। বাইরের দরজার সামনে রাস্তায় শ্বশুরমশাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও দেখল না। ঠাকুরদা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজেকে সামলে, জামাইয়ের নাম ধরে ডাকলেন। জামাই তবুও বাইরে এলো না। বসে বসেই জিজ্ঞাসা করল, ‘কে?’ ঠাকুরদা রেগে গিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, ‘আমাকে চেন না? আমি রামাইয়া, পাশের গাঁয়ের।’

‘বারে বা! পাশের গাঁয়ে রামাইয়া নামের তো অনেক লোক আছে। আমি কি সবাইকে চিনি?’ বলে বন্ধুদের সঙ্গে হো হো ক’রে হেসে উঠল। ঠাকুরদার রাগের সীমা রইল না। হুঙ্কার দিয়ে হাতের ছড়ি সামলাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে বেয়ান বাইরে উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি কে?’ ঠাকুরদা একটু শান্ত হয়ে বললেন, ‘দিদি, আমি লক্ষ্মীর বাবা।’

‘কোন লক্ষ্মী?’

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ঠাকুরদা তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরে এলেন। এ অপমান ওঁর মজ্জায় মজ্জায় মিশে গেল। তারপর আর কখনও মেয়ের শ্বশুরবাড়ী যান নি। ঠাকুরমাকেও যেতে বারণ ক’রে দিলেন। বললেন, ‘মনে কর তোমার মেয়ে মরে গেছে। আর কক্ষনো ও বাড়ীর নামও মুখে এনো না। ঠাকুরমা কেঁদে কেঁদে শরীর পাত করতে বসলেন। ঠাকুরদার মন ছিল নরম। নিজের দুঃখকে আমল না দিয়ে ঠাকুরমাকে সান্ত্বনা দিতে বসলেন। পর্বের দিন মেয়ে-জামাইকে নেমন্তন্ন করার জন্য ঠাকুরমাকে আবার ওদের বাড়ী পাঠালেন। কিন্তু জামাইও গোঁ ধরে বসল। শাশুড়ীর সব কাকুতিমিনতি অগ্রাহ্য করল। আবার ঠাকুরমা বোঝাতে লাগলেন, ‘বাবা, যেমন তোমার মা আমিও তেমন, পর্বের দিন

আমাদের ওখানে গিয়ে আমার হাতে খেলে আমি যে কত শান্তি পাবো।' তক্ষুণি বেয়ান বলে উঠলেন, 'পর্বের দিন তোমার ওখানে গিয়ে ভিক্ষের চাল খাবে কোন দুঃখে? আমার বাড়ীতে ডাল ভাত কি জুটবে না? যেমন আমি মা তেমন তুমিও! বাঃ বাঃ কি চমৎকার কথাই বলেছ। শুধু বড় বড় কথা বলতে শিখেছ, কিছু দেবার তো নামগন্ধ নেই।'

"তারপর থেকে ঠাকুরমা কিছু না কিছু দেবার কথা দিয়ে মেয়ে-জামাইকে বাড়ী আনতেন। এসব করার উদ্দেশ্য ছিল যাতে অন্ততঃ পর্বের দিনেও মেয়ে-জামাই একরাত একসঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু সে সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে পিশেমশাই খাওয়া হয়ে গেলেই, ওঁর প্রাপ্য পকেটে পুরে বিদায় নিতেন। ঠাকুরমার কষ্ট দেখে পিসিমা সান্ত্বনা দিতেন, 'মা, তুমি ভাবছ কেন? রামায়ণ, মহাভারতে তো এমন কত কথাই রয়েছে। শ্রীরামচন্দ্র, সীতাকে ত্যাগ করার পর আবার নিয়েছিলেন, না? মহারাজা নল প্রিয়তমা দময়ন্তীকে বনে ছেড়ে গিয়েছিলেন।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওঁদের মিলন হয়েছিল কি না? সাবিত্রীকে একলা ফেলে গিয়েছিলেন সত্যবান কিন্তু শেষে ওঁর প্রাণ ফিরে পেল তো সাবিত্রী? যারাই কষ্ট পেয়েছে শেষে তারা সুখী হয়েছে। ধর্মের পরাজয় হবার কথা শুনেছ কখনও? এসব জেনেও তুমি কেন এত কষ্ট পাচ্ছ মা?'

"পিসিমা এই আশায় চার বছর ধৈর্য ধরে সংসার করছিলেন। তাঁর সততা, সহিষ্ণুতা ও রূপের সারা গাঁয়ে খ্যাতি ছিল।"

"পিসিমার রূপ দেখে পিশেমশাই-এর প্রেয়সী মোহনাঙ্গীর একবার ওঁর সততা পরীক্ষা করার খুব ইচ্ছে হল। পিশেমশাইকে চমকাবার জন্য বলল, 'আচ্ছা, আপনি আমায় সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, না? আমাকে পাশে নিয়ে আপনার স্ত্রীর সামনে দাঁড়াতে পারেন?' তখন পিশেমশাই মোহনাঙ্গীর দিকে আড় চোখে চেয়ে নিশ্চয়ই সগর্বে মৃদু হেসেছিলেন।"

"পরের দিনই পিশেমশাই মোহনাঙ্গীকে নিয়ে বাড়ীতে হাজির

হলেন। পাল্কী থেকে নামতেই উনি তাঁর প্রেয়সীর পা ধোওয়াবার হুকুম দিলেন পিসিমাকে। সত্যিই কি কাণ্ডই উনি করলেন। আর কোনো স্ত্রী হলে এ সহ্যই করতে পারত না। কিন্তু পিসিমা হাসিমুখেই সব করলেন। মোহনাঙ্গীর পা ধুয়ে কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছিয়ে ওঁকে ঘরে এনে বিছানায় বসালেন। নানারকম খাবারে সাজানো থালা ওর সামনে রেখে, দুধের পেয়ালা ওর হাতে দিয়ে পিসিমা দাসীর মত কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। মোহনাঙ্গীর এঁটো খাবারগুলো পিশেমশাই খাচ্ছিলেন, পিশেমশাই এর এঁটো জল মোহনাঙ্গী খাচ্ছিল। দু'জনেই এ ওর এঁটো খেয়ে নানারকম রসিকতা ক'রে রঙ্গরসে ঢলে পড়ছিলেন। এসব পিসিমা সহজ-ভাবেই দেখে যাচ্ছিলেন, ওঁর চেহারায় না ছিল কোন বিষাদের রেখা, না রাগ বা ঘৃণা। মোহনাঙ্গী আড় চোখে সর্বক্ষণ পিসিমার চেহারা ও ভাবভঙ্গী পরীক্ষা করছিল। ওরও খুব আশ্চর্য লাগল। কাছা দিয়ে কাপড় পরা, মৃদু হাস্যে উদ্ভাসিত চেহারা, বীতরাগ ও আনন্দমূর্ত্তি পিসিমাকে দেখে মোহনাঙ্গীর লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল। রূপের গর্বে গর্বিতা মোহনাঙ্গী পিসিমার কাছে হেরে গেল, ওর সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে গেল। যাবার সময় পিসিমার দেওয়া আন্তরিক আশীর্বাদে মোহনাঙ্গীর সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটল। সে মোহনাঙ্গী আর রইল না। কৃতার্থ হয়ে পিসিমাকে দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রে তার বাড়ীতে ফিরল।

সেদিনই মোহনাঙ্গী তার প্রেমিককে বিদায় দিল। শুধু বিদায়ই নয়, ওঁকেও সুপথে আনবার জন্য জ্ঞান দেবার চেষ্টা করল। বলল, 'দেখুন, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর পতি হয়ে যে আপনি এখানে আসেন সেটা কি ভারী অন্যায় নয়? আমি আর এ সহ্য করতে পারব না। আমরা ভদ্র নয়, সেজেগুজে রূপের ব্যবসা ক'রে থাকি, আপনার নিষ্পাপ, রূপবতী স্ত্রীকে ফেলে আমাদের পিছনে পড়ে থাকার কি কোনও অর্থ হয়? এ শুধু মোহ। ওঁর সৌন্দর্য, সততা সবই অপার্থিব। যার জন্য আপনি এখানে না এসে থাকতে পারেন না,

তার মেয়াদ আর কতদিন ? এ যৌবন যে কোনো দিন শেষ হবে। এসব কখনও কি ভেবেছেন ? যা হয়েছে; হয়েছে। ও বিষয় ভেবে লাভ নেই। উনি দেবী, তাঁর প্রতি আর অন্যায় আমি হতে দেব না। আমি বারবনিতা বটে, তবে আমারও হৃদয় আছে। ওঁকে বঞ্চিত ক'রে আর আমি আপনাকে এখানে আসতে দেব না। আপনার সুবুদ্ধি হোক। আপনি কত বড় অপরাধ করেছেন সে যদি বুঝতে পারেন আর আমি কত বড় পাপ করেছি তারজন্য যদি আমি সে দেবীর কাছে ক্ষমা পাই···' বলতে বলতে মোহনাঙ্গী কেঁদে ফেলল।

"পিশেমশাই ভ্যাবাচাকা। খেয়ে যেই মোহনাঙ্গী বলে ডেকে ওর কাছে যাবার জন্য পা বাড়ালেন তক্ষুণি সে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। সে দরজা পিশেমশাই-এর জন্য আর কখনও খুলল না। মনকষ্টে পিশেমশাই অসুখে পড়লেন। স্বপ্নে আবোল-তাবোল বকতে লাগলেন। কখনও একেবারে কাতর হয়ে পড়তেন, কখনও উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করতেন। এ সব ক্রমশই বেড়ে চলল। ওষুধে কোনও উপকার হলো না।

"পিশেমশাই-এর ব্যথার কারণ কি পিসিমা ভাল করেই জানতেন। উনি নিজে মোহনাঙ্গীর বাড়ী গেলেন। কিন্তু মোহনাঙ্গী তার আগের দিনই গাঁ ছেড়ে আর কোথাও চলে যায়। পিসিমা নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরলেন। পিশেমশাই-এর মানসিক বেদনা অবসানের আর কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা রইল না। যতদিন যেতে লাগল অবস্থা খারাপ হল। আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পিসিমা দিনরাত স্বামীর সেবায় লেগে রইলেন। কিন্তু অবস্থার উন্নতি হল না। তখন তাঁর অন্তিম অবস্থা। পিশেমশাই-এর কাছে বসে পিসিমার মনে হঠাৎ কি হল, উনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভগবানের নাম নিয়ে স্বামীর বিছানার চার পাশে পরিক্রমা করলেন। ভগবানের কাছে বোধহয় মিনতি করলেন, 'হে প্রভু, আমার আয়ু আমার স্বামীকে দিয়ে আমায় তুমি তুলে নাও। আমার স্বামীর সামনেই আমার ইহলীলা সমাপ্ত হয়ে যাক, এই আমার প্রার্থনা, আমি আর কিছু চাই না।

ভক্তকে উদ্ধার করার জন্যই বোধহয় ভগবান ওঁকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। পূণ্যময়ী পিসিমার প্রার্থনা ভগবান শুনলেন। পিশেমশাই ভালো হয়ে গেলেন, পিসিমা অসুখে পড়লেন। সে সময় ঠাকুরমা ভরা পোয়াতি ছিলেন। মেয়ের অসুখের খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে চলে এলেন। চিকিৎসা করার চেষ্টা করলে পিসিমা বারণ করলেন। 'আমার স্বামীকে বাঁচাবার জন্য ভগবানকে আমার প্রাণ সমর্পণ করেছি মা। এই মানতের বিরুদ্ধে তুমি যদি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা কর তো সেটা পাপ হবে। আমাকে ভুলে যাও মা! আমি ভগবানের কাছে যাচ্ছি।'

"পিসিমার অবস্থা যখন খুবই খারাপ, ঠাকুরদা তখন আগেকার মান অপমান সব ভুলে জামাইবাড়ী গেলেন। পিশিমার মানত থাকা সত্বেও চিকিৎসা আরম্ভ ক'রে দিলেন।"

"কিন্তু আরও একটা তুর্ভাগ্যের কারণ ঘটল। পিসিমার তখন মাসিক হয়েছিল। জ্বরে গা পুড়ছে। এমন অবস্থায়ও শাশুড়ীর হুকুম হল শুদ্ধি স্নান করাতেই হবে পিসিমাকে। মানুষ তো নয়, ডাইনী ছিলেন ওঁর শাশুড়ী। ঠাকুরমা কেঁদে সারা হলেন কিন্তু উনি কারুর কথা শুনলেন না। বললেন, এবাড়ীতে এরকম অনাচার হতে দেবেন না। ঠাকুরদা যেই গাড়ী ডাকতে গেলেন, ডাইনীটি এক-ঘড়া জল বৌ-এর উপর ঢেলে দিল।"

"সেদিনই রাতে পিসিমা অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পরদিন সকালে একদিকে সূর্যের আবির্ভাব হল, আরেক দিকে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার সে প্রতিমা অস্ত গেল। পূর্ণগর্ভা ঠাকুরমা এই শোক সহ্য করেও বেঁচে রইলেন গর্ভের সন্তানের জন্য।"

"আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। পিসিমার শরীর যেই চিতার আগুনে জ্বলে ছাই হলো ঠিক সে সময় ঠাকুরমার কোলে ছেলে জন্মাল। অনেকদিন বাদে ছেলে হলো। কত বিচিত্র এ পৃথিবী, কত বিচিত্র এর লীলা খেলা!"

"ভগবান বোধহয় মাটির এই খেলনা নিয়ে খেলতে চান কখনও, কখনও।"

"একটি সন্তান গেল, আরেকটি এলো। মা কাতর হবে, কি আনন্দিত হবে? ঠাকুরমা নিজে এর উত্তর দিতে পারেন নি। আমার বাবা সেই সন্তান।"

"বড় হবার পর বাবা পিসিমাকে আমার মধ্যে ফিরে পেলেন। আমি বড় হবার পর ঠাকুরমা এই গল্পটা শুনিয়ে ছিলেন। তখনকার সে মনের অবস্থা আমি কি ক'রে বর্ণনা করবো?"

ভানু থামল। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, "কি বিচিত্র কাহিনী তুমি শোনালে ভানু! ঠাকুরমা কি বলেছিলেন? তোমার মধ্যে পিসিমার লক্ষণ দেখা যায়?"

"হ্যাঁ, কথাটি ঠিক। এখন তো আমার মনে হয় আমাদের দু'জনের শুধু চেহারাই একরকম নয়, ভাগ্যরেখাও একরকম। পিসিমার কথা সব শুনে সেদিন ভেবেছিলাম—উনি যতই রূপবতী, গুণবতী হন, স্বামীকে আপন ক'রে নেবার বুদ্ধি আর ক্ষমতা ওঁর ছিল না।' ভালোমানুষ হওয়ার জন্যই নিজের প্রাণ হারালেন। পিসিমার বদলে আমি যদি হতাম তো এ কষ্ট ভোগ করতে হত না...। কিন্তু আজ সেদিনের কথা ভেবে আমারই হাসি পাচ্ছে, দাদা। আমার এ ধারণাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দেবে এরকম কোনও নির্মম সত্য আমার ভবিষ্যতে লুকানো রয়েছে, সে কি তখন কেউ বললেও আমি বিশ্বাস করতে পারতাম?"

"বিয়ের আগে আমি কি ভাবতাম জানো? সেসব দিনের কথাই আলাদা ছিল, আর সেদিনের মানুষও ছিল অন্যরকম। সে সময় নারীর, স্ত্রী বা পুত্রবধূ বলে কোনও মান-সম্মান ছিল না। আদুরে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ীতে কষ্ট পেতে দেখেও মা, বাপের সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। চিরপ্রচলিত নিয়মকে ভাঙ্গবার সাহস ওঁদের ছিল না..."

"আমি তখন ভেবেছিলাম, কিন্তু আজ যদি পিসিমা আবার

জন্ম নেন, তো তেমন করে প্রাণ আর দিতে হবে না ওঁকে। আজকালের পুরুষজাতি বেশী সত্যপ্রিয়, উদার আর ন্যায় প্রিয়। স্ত্রীকে ওঁরা বুঝতে পারেন। ওঁরা স্ত্রীকে মান দেন, ভালবাসেন, স্ত্রীকে চান। আস্তে আস্তে স্ত্রীরা সব বিষয়ই পুরুষদের সমান হয়ে উঠছেন। ওঁদের পুরুষরাই এ সুযোগ দিচ্ছেন। এই নতুন যুগের স্ত্রী পুরুষের মধ্যে মন-কষাকষি বা সংঘর্ষের প্রশ্নই উঠতে পারে না। আজকালের পুরুষরা সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী। সেকেলে গোঁড়া লোকেদের মত ওঁরা স্ত্রীদের বর্তমান প্রগতি, সভ্যতা থেকে বঞ্চিত করেন না। একথা ভাবতেও ওঁরা লজ্জা অনুভব করেন...”

“পিসিমাতে আমাতে আকাশ-পাতাল তফাৎ। উনি যা করতে পারেন নি, আমি তা করতে পারব। পিসিমা স্বামীকে শাসন করতে অসমর্থ ছিলেন, কিন্তু আমি তা সহজেই ক'রে নেব। পিসিমা সম্মান পান নি, কিন্তু আমি তা পাবই। পিসিমা যে স্বর্গের কল্পনাও করতে পারেন নি তা হবে আমার অনায়াস-লব্ধ। এসব প্রগতি বিকাশ, পরিবর্তন পিসিমা যদি দেখতে পেতেন...! এরকম আরও কতরকম কথা আমার মনে উঠত।”

“কিন্তু দাদা! কি ভাবতাম, আর শেষে হ'ল কি? লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে না কেন? মন ভেঙ্গে পড়ছে না কেন?”

“আমার সব কল্পনা শুধু কল্পনাই রইল...একেবারে মিথ্যে। পিসিমার সময় থেকে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয় নি। মেয়েদের জীবনে সেরকম প্রগতি আসে নি। পুরুষদের মধ্যে পরিবর্তনের কোনও আভাসও নেই। স্ত্রী, পুরুষ সমান, স্ত্রীদেরও অধিকার আছে, তার নিয়ম-কানুন, এসব শুধু কথারই কথা, শুধু কেতাবী কথা,—এসব মিথ্যে। বাস্তব জীবনে, আমার নিজের অনুভূতিতে আমি পিসিমার থেকে কিছুমাত্র উপরে উঠতে পারি নি।”

একটু থেমে আবার ভানু বলতে আরম্ভ করল, “পিশেমশাই-এর বেশ্যাবাড়ীই সব ছিল। পিসিমা বোকা, নিজের স্বামীকে বশ

করতে পারলেন না। কাকাবাবু তাসের নেশায় ঘরবাড়ী সব ভুলে গেলেন, বেচারী কাকীমা কিছু করতে পারলেন কি, নিরুপায় হয়ে সবই সহ্য করতে হল। স্বামী যার হোটেলেই দিনরাত কাটান, তাঁর স্ত্রী ভালবাসার জোরেও কি তাকে বাড়ী ফেরাতে পারলেন? আমি ভাবতাম সেকালের মেয়েরা শুধু বোকামীর জন্যই স্বামীর ভালবাসা তো পেলই না, উল্টে ওদের বদঅভ্যাস গুলো বাড়িয়ে দিল। তখনকার স্ত্রীর আদর্শ হল পতিব্রতা, ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার মূর্তি হওয়া; তাই এসবের জন্য অনর্থক কত কষ্ট ওদের সহ্য করতে হয়েছিল।"

"কিন্তু সেকালের স্ত্রীরা কেন এরকম করতেন, ওঁদের কাছে অন্য কোনও উপায় ছিল কিনা, সে বিষয় কিছুই তখন ভাবি নি। স্ত্রীর আত্মসম্মান, ব্যক্তিত্ব, লক্ষ্য ও আদর্শ যত বড়ই হোক না কেন, ওকে ছোট থাকতেই হবে। যে স্ত্রীজাতিকে সংসার এত শ্রদ্ধা ক'রে তাকে স্বামীর কাছে তৃণের চেয়েও তুচ্ছ হয়ে থাকতে হয়।"

ভানু এই মীমাংসায় পৌঁছেচে। কিন্তু আমার তা পছন্দ হল না।

"পুরুষ হিসাবে তোমায় একটি কথা বলছি ভানু। আমি জানি তোমার দাম্পত্য জীবন অন্যদের মত নয়। তোমার স্বামীর কোনও দোষ থাকতে পারে, যার জন্য তুমি কষ্ট পাচ্ছ। কিন্তু শুধু নিজের স্বামীর প্রবৃত্তি দেখে, সব পুরুষদের উপর এরকম বিদ্বেষ ভাব হওয়া কি ঠিক? সম্পূর্ণ পুরুষ জাতিকে দোষ দিও না। স্ত্রী জাতির প্রগতির যে আশা তুমি করেছিলে তা পুরোমাত্রায় না হলেও যথেষ্ঠ পরিমাণে হয়েছে, তার প্রমাণ তুমি এত সব কথা বুঝতে পারছ। এসব বিষয় তোমার ভায়ের সঙ্গে তর্ক করতে পারছ। আগেকার স্ত্রীরা এভাবে কথা বলতে পারত কি?"

"তুমি ঠিকই বলেছ যে, আমাদের চিন্তাধারার তেমন পরিবর্তন আসেনি এখনও। পুরুষের শিরায় যে রক্ত শত সহস্র বর্ষ ধরে বয়ে আসছে, তার বদলে নতুন রক্ত সঞ্চারিত হতে কত যুগ লাগবে? প্রগতিশীলা নারীর পরির্তনের ধারা অতি তীব্র। কিন্তু অধিকারের

গর্বে মত্ত পুরুষ তার সঙ্গে চলতে পারছে না। তাইতেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে।"

"রাগের চোটে আমি কিছু বেশীই বলে ফেলেছি বোধহয়। কিন্তু তুমিই আমাকে বল দাদা, পুরুষ নিজের মতটাই সব সময় কেন চালাতে চায়? তাহলে বিবাহের প্রয়োজনটা কি? শুধু কি সৃষ্টির ধারাকে চালিয়ে যাবার জন্য, যাতে আমরা যাবার আগে আমাদের সন্তানদের প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারি, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে অসমতা সৃষ্টি না করেও প্রকৃতির এ পরম ধর্মকে পালন করা যায়। কিসের জন্য বিয়ে হবার পরেই স্ত্রী, পুরুষের ক্রীতদাসী হয়ে যাবে? একজন মানুষ অন্য জনের উপর তার দাবী জানিয়েই কেন সুখী।"

"স্ত্রীকে নিজের সম্পত্তি ভেবে পুরুষের গর্ব করার কি কোনও মানে হয়? এ সব ভাবতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়।"

"আমার ভাবনা চিন্তা করবার কিছু নেই। আমায় সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকতে হবে—এসব তো ঠিক, কিন্তু কি করে তা সম্ভব?"

"আমি জানি, আমি যখন বদলে যাব, আমার কোনও দুঃখকষ্ট থাকবে না।"

"আমার আর কোনও ভাবনা থাকবে না যেদিন আমি জানব পুরুষ ছাড়া স্ত্রীর কোন অস্তিত্ব নেই, যেদিন মনকে বোঝাতে পারবো আত্মাভিমান উদর পোষণের থেকে বড় নয়। যে পুরুষ স্ত্রীকে হেয়-জ্ঞান করে তার সঙ্গে শান্তিতে থাকতে পারব যদি নিজের ব্যক্তিত্বকে জলাঞ্জলি দিতে পারি। সেদিন আমার নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও শান্তির দিন আসবে। কিন্তু এতটা পরিবর্তন কি আমি আনতে পারব? তোমার কি মত? তুমিও কি মনে কর এই পরিবর্তন আসা দরকার?" ভানুর চোখ থেকে জল ঝরতে লাগল। আমি থতমত খেয়ে তার দিকে চেয়ে রইলাম। ভানু কেঁদেই চলেছে, কি অসহ্য তার বেদনা।

"তোমার এ প্রশ্নের উত্তর যে কি হবে তা আমি বুঝতেই পারছি না, ভানু! যদি কোন মতে বুঝতেও পারি, তো পুরুষ হওয়ার জন্য

তোমাকে তা আমি বোঝাতে পারব না। সে ক্ষমতা আমার নেই।"

"আর আমি কিছু বলব না। কিন্তু আমার একটি মাত্র ইচ্ছে যে, আমার ছেলে বড় হয়ে উন্নতি করুক, সে আদর্শ পুরুষ হোক। অন্ধকারে উজ্জ্বল মণির মত এ পুরুষ সমাজকে আলোকিত করুক আর অন্যায়কে ঘৃণা ক'রে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ ক'রে, অভাগার দুঃখে দুঃখিত হবার মত ক্ষমতা অর্জন ক'রে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠুক। সেদিন...ওগো সেদিন কি আসবে কখনও, বলো না দাদা ?"

"আসবে, আসবে ভানু! নিশ্চয়ই আসবে। তোমার ছেলে উদয় তোমার মত মায়ের শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে নিশ্চয়ই তার জীবনকে আদর্শ করে তুলবে।"

বড় করুণ হেসে বলল ভানু, "কিন্তু...দাদা কোনো দিন যদি আমিই আর লালন-পালন করবার জন্য বেঁচে না থাকি..."

"ভানু! তুমি কি বলছো ?"

"এতে ভয়ের কি আছে দাদা ? তুমি তো রয়েছই। তুমি আমাকে ভাল করে বোঝাও, আর আমার ইচ্ছেটা কি সেও জানো।"

"এমন কথা মুখে এনো না ভানু। তোমার সুখ-দুঃখের আমি সর্বদাই সঙ্গী থাকব। কিন্তু এত বড় দায়িত্ব আমার উপর দিও না। তেমন দিন আসতেই পারে না। তুমি মা, এসব দায়িত্ব তোমারই। ভানু, তোমার কিছু হয়ে গেলে তোমার এ ভাইটির কি অবস্থা হবে কখনও ভেবেছ কি ? অন্য কারুর চোখের জলের কি কোনও মূল্য নেই ? অন্ততঃ তা ভেবেও তোমায় বেঁচে থাকতে হবে। তোমার নিজের জন্য নয়, অন্য কারুর জন্যও নয়, শুধু তোমার ছোট ছেলের জন্যই। তোমাদের মত মায়েরাই যদি সব দুঃখ-কষ্ট সহ্য ক'রে সন্তানকে দেশের ভবিষ্যতের জন্য গড়ে না তোলে তো কি ক'রে এ অন্যায়, অত্যাচার দূর হতে পারে ? এটাই তোমার লক্ষ্য হোক ভানু! এ চিন্তা মনেও এনো না।"

"না দাদা! আমি সব কিছুই সহ্য করে ছেলেকে নিজের হাতে তৈরী করবো।" বলে ভানু ছেলের মুখে চুম্বন দিল।

পরিস্থিতি যত অসহনীয় হয়ে উঠুক না কেন ভানু বেঁচে থাকবেই, কারণ সে তার ছেলেকে অসম্ভব ভালবাসে। সব মায়েরাই নিজের সন্তানকে এত বেশী ভালবাসে কিনা আমি জানি না, কিন্তু ভানুর ক্ষেত্রে একথা বলা যেতে পারে। সে শুধু সন্তানকে ভালবেসেই ক্ষান্ত হয় না, তাকে আদর্শ পুরুষ তৈরী করতে চায়। যার এত উচ্চ আদর্শ সে কখনও ভুল করতে পারে না তাই ছিল আমার বিশ্বাস।

একদিক দিয়ে দেখলে মনে হয় ভানুর মস্তিষ্ক স্বাভাবিক নেই। ওর চিন্তাধারা একেবারে সাদাসিধে। ও ভাবে, ন্যায় ও অন্যায়— এ দুটোর একটাই হতে পারে। যখন ওর আশা সফল হয় না ওর মন বিদ্রোহ ক'রে বসে, তারপর একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। ধৈর্য হারিয়ে তখন তার ইচ্ছামত একটা মীমাংসায় পৌঁছয়। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্য হারানো কি শক্তির পরিচয়? ও বলে, হ্যাঁ। ব্যক্তিত্বকে সুদৃঢ় করা আবশ্যক। ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে যদি জীবনও শেষ করতে হয় সেও ভালো। ভানু পরিস্থিতিকে মেনে নিতে পারে না। এটা একটা মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর কোনও সমাধান নেই। ভাবতে ভাবতে একবার মনে হলো যদি ওকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কোনও ট্রেনিং ক্লাসে ভর্তি করে দিই? কোথাও চাকরীতে ঢুকিয়ে দিই? যে মানুষটা কখনও বদলাবে না তারজন্য কতদিন মিছিমিছি নরক যন্ত্রণা ভোগ করা যায়?

আমার পড়াশুনা শেষ হতে আর চার মাস বাকী। আমি চাকরী পেয়ে যাবো। তারপর তো কোনও কথাই নেই, ভানুর যেমন ইচ্ছে হবে তাই আমরা করতে পারব। ভেবে মনটা একটু শান্ত হল।

ভানুর সঙ্গে এক মাসের উপর দেখা হয়নি। কতবার যেতে গিয়েও যাওয়া হলো না। যাওয়া মানেই আবার কথা শুনতে

হবে। একমাস ধরে যদি ওরা শান্তিতে থাকে তবে জানবো এবার সূর্য পশ্চিম দিকে উঠছে। কিন্তু ভানুকে না দেখে বেশীদিন আমিই বা কি করে থাকি? সেও দুঃখ পাবে। ওর কাছে যে লাইব্রেরীর বইগুলো আছে যেগুলো ফেরৎ দেবার সময় হয়ে গেছে। স্নান করতেই যাচ্ছিলাম, তা না ক'রে কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

"একমাস বাদে মনে পড়ল দাদা?" ভানু হেসে বলল।

"মোটেই সময় পাইনি। পরীক্ষার আর ক'দিনই বা আছে? আচ্ছা বলতো, আমার জামাই বিট্টু কি খবর? কোথায় গেছে?" বলতে বলতে বসে পড়লাম।

"পাশের বাড়ী খেলতে গেছে বোধহয়।"

"তারপর, তোমাদের চলছে কেমন? জামাইবাবুর কি খবর?"

"আমরা দু'জনেই ভাল। কিন্তু কথাবার্তা বন্ধ।"

"কবে থেকে?"

"এই কিছুদিন হল, বাবার একটা চিঠি এসেছিল।"

"কি লিখেছিলেন উনি?"

"একটা বিশেষ খবর ছিল। ঠাকুরমা কাউকে এক হাজার টাকা সুদে ধার দিয়েছিলেন। মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন সে টাকাটা উশুল ক'রে যেন আমায় দেওয়া হয়। এ কথাটা আমি তখনই জানতাম। তখন আমি ম্যাট্রিক পড়তাম, মাত্র পনের বছর বয়স। ভাবলাম হাজার টাকা নিয়ে আমি কি করব? বাড়ীতে সকলে এ নিয়ে ঠাট্টাও করেছিল, শেষে একথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এই আট বছরের সুদ শুদ্ধ সব টাকা এক সপ্তাহ আগে উনি ফেরৎ দিয়েছেন। সুদ সমেত সব শুদ্ধ দু'হাজার টাকা হয়েছে। বাবা জিজ্ঞাসা করেছেন, ও টাকার কি করবেন। এখন আমি দু'হাজার টাকার মালিক। তোমার জামাইবাবুও অনেক বদলে গেছেন।"

"সত্যি?"

"সত্যি কি মিথ্যে তা বলতে পারি না। কিন্তু ও চিঠিটা দেখার

পর থেকেই তোমার জামাইবাবুর ভোল পালটেছে। নিজের ভুল বুঝেছেন। তাস খেলাও ছেড়েছেন। এক সপ্তাহ ধরে বাড়ীতেই রয়েছেন। অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে ওঁর ব্যবহারে। বিট্টুর সঙ্গে খেলাও করেন। এখন তাঁর আচার ব্যবহার যথেষ্ট ভালো হয়েছে। একদিন সন্ধ্যেবেলা আদর করে আমায় পাশে বসিয়ে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে আরম্ভ করলেন। আমাদের বিয়ের পর এটা একটা অভূতপূর্ব ঘটনা।"

"বললেন, 'ভানু আমি একেবারে বদলে গেছি। তুমি বিশ্বাস করছ তো ?"

'এতটুকু সময়ের মধ্যে বিশ্বাসের কথা কি বলা যায় ?'

'তুমি কি জাননা, সব জিনিষেই আমার তাড়া। তুমি না ক্ষমা করলে আমার চলবে কি করে ?' এসব বলার পর আসল কথায় এলেন। 'তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করো না। আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গী তুমি ছাড়া আর কে হবে ? এ সংসারের দায়িত্ব আমার সঙ্গে তোমারও। আসল কথা, আমি অনেক বাজে খরচ করে ফেলেছি। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে কি লাভ ? এখন বারশো টাকা ধার হয়েছে। কেমন ক'রে শোধ করবো বুঝতে পারছি না।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "বারশো টাকা ?"

"তবে আমি একটুও আশ্চর্য হই নি। শুধু এটুকু ধার হয়েছে জেনেই বরং আমি আশ্চর্য হলাম। একজন সামান্য ক্লার্ক রাতদিন ক্লাবে পড়ে থাকার ক্ষমতা পেল কোত্থেকে ? এ ছাড়া, কয়েকবার বাইরেও গেছেন। প্রত্যেক চাকরীর জন্য দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারভিউয়ের ছুতোর বাইরে যাওয়া, টি. এ-র কথা বলে শ, পঞ্চাশ ধার করা, বরাবরই এরকম চলছে।"

"আমি যদি বলতাম, এ ভাবে ধার নিয়ে ঘোরো কেন ? তখন বলতেন, 'এমন না করলে অন্য দেশ দেখব কি করে। ধার তো শোধ হয়েই যাবে।'

"দেশ দেখার ইচ্ছে তো আমারও হয়। উনি যদি শুধু নিজের স্বার্থই দেখেন তো আমারটা দেখবে কে? দশটা জায়গা একা একা না ঘুরে, দু'তিনটে ভালো জায়গায় আমায়ও সঙ্গে নিলে পারতেন তো।"

"যখন সিমলা থেকে ইণ্টারভিউ দিতে ডাকল তখন উনি দু'শো টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার কাশ্মীর দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। সবাই বলে 'তাজমহল' তো প্রত্যেকেরই দেখা উচিত। অন্ততঃ এ সব জায়গায় ও আমায় সঙ্গে নিয়ে যেতেন...আমার স্বামীই যদি আমায় না নিয়ে যান তো আর কে নিয়ে যাবে? আমার জন্য আলাদা কোনো ব্যবস্থাও করতে হত না। উনি তো যাচ্ছিলেনই, সঙ্গে আমিও চলে যেতাম। তার কি জবাব দিলেন... আচ্ছা, ওসব কথা থাক্ গে। তুমি বারশো টাকা ধার শুনে আশ্চর্য হলে বলেই আমিই এসব বলে ফেললাম।"

"আচ্ছা বেশ, তারপর কি হলো বল। তোমার থেকে টাকা চাইলেন?"

"আরে, সব শোন তো আগে। বললেন, 'ভানু! আমি কোনো উপায় দেখছি না। এ কথা ভাবতেই আমার প্রাণ কেঁপে উঠছে। ভেবে ভেবে আমার শরীরও খারাপ হয়ে গেল। আমি কি করি, বল তো?' এ ভাবে অভিনয় করলেন।

"ওঁর এ পরিবর্তন কত অদ্ভুত। পয়সার জন্য মানুষ কত দীন হতে পারে। তা ছাড়া নিজের স্ত্রীকে যে এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কিন্তু স্বার্থের বেলায় তারই কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে। আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?"

'কি ভাবছ ভানু? আমি কি করি, বলো না?'

"আমাকে জিজ্ঞেস ক'রে তো ধার করো নি? শোধ দেবার সময়ই আমার পরামর্শের কি দরকার?"

'ভানু, এরকম করো না। ধার তো শোধ করতেই হবে, কিন্তু আমার কাছে টাকা কোথায়?'

"টাকা নেই তো কিসের ভরসায় ধার নিয়েছিলে ?"

'তখন আমি এতটা খেয়াল করি নি। ভুল হয়ে গেছে।'

"বাড়ীর খরচ কি এত বেশী ছিল যে, তোমায় ধার নিতে হল ? আজ পর্যন্ত আমার পরণের কাপড় মা জুগিয়ে যাচ্ছেন। কোনো চাকরবাকরও নেই, আমিই সব কাজকর্ম করছি। কোথাও বেড়াতে যাওয়া, সিনেমা দেখা তো কবে শেষ হয়ে গেছে। তাহলে ? প্রত্যেক মাসে যে দেড়শো টাকা পাচ্ছ..."

'এ সব কথা এখন ছাড়ো ভানু ! এ সব তুলে এখন কি লাভ ? আমার সুখ-দুঃখ কি তোমার থেকে আলাদা ? পরিবার যেমন আমার তোমারও তেমনি।'

"একসঙ্গেই অনেক ঘটনা মনে পড়ে গেল, আমি আর থাকতে পারলাম না, কঠিন স্বরে বললাম, 'সুখ-দুঃখ ? বিট্টু হবার আগেই যখন জ্বরে ভুগে সোডা খাবার ইচ্ছে হয়েছিল বাড়ীতে সব জায়গা খুজে দুটো পয়সা পর্যন্ত পাইনি। তখনকার আমার মনের অবস্থা কি তুমি অনুমান করতে পারো ? যখন আমার পায়ে খুব লেগেছিল, তোমার জন্য স্নানের জল রাখতে পারি নি বলে রেগে দু'থাপ্পড় মেরেছিলে, মনে পড়ছে ? বড় সখ ক'রে ধূপদান কিনে তোমায় দেখাতে গিয়েছিলাম, তখন কি বলেছিলে, কার অনুমতি নিয়ে আমি কিনেছি ? সে সব কথা কি ভোলবার ? মাসীমাকে কলাপাতা দিয়েছিলাম বলে বকাবকি ক'রে আমায় কাঁদিয়ে ছেড়েছিলে। আরও কত ঘটনা বলবো ? আমার যে কত সুখ, সে কি আমি জানি না ? সংসারের দায়িত্ব আমার কবেই বা ছিল, আজ সে দায়িত্ব কি করেই বা এলো ? কেন এলো ? আর কতদিন থাকবে সেটা ? জানতে পারি কি ? আমার ইচ্ছেমত কোনও কাজ তুমি করতে দাওনি, আমায় কীটেরও অধম ক'রে দূরে সরিয়ে রেখেছিলে। সে সব কি ভুলে যাবার ? তোমার এ সব মিষ্টি কথায় এখন কোনও কাজ হবে না। যতদিন আমি বাঁচবো

আমার টাকা থেকে এক কানাকড়িও তুমি পাবে না, আর মরবার পরও যাতে না পাও তারও ব্যবস্থা করেই মরব।”

“চুপটি করে বসে রইলেন উনি অনেকক্ষণ।”

‘ভানু! সত্যিই আমি অনেক ভুল করেছি। আমায় ক্ষমা করবে না তুমি?’

“ভুল ক’রে তারপর ক্ষমা চাওয়া আমারও পছন্দ নয়।”

‘আচ্ছা তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন করো। কিন্তু আমাকে ক্ষমা তো করে দাও! রাগের মাথায় যখন যা বলেছি সে সব ভুলে যাও, আমার জন্য…’

“হঠাৎ যে পরিবর্তন এসেছে তা চলেও যাবে হঠাৎ। প্রত্যেক জিনিষের জন্য একটা আধার চাই।”

‘বলছি আমি বদলে গেছি। বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি ভাবছ, আমি তোমায় ভালবাসি না? এটা তোমার ভুল ভানু।’

“ভুল আমার নয় তোমার। তুমি ভাবছ আমায় বিশ্বাস করাতে পারবে কিন্তু সেটা তোমার ভুল।”

‘আচ্ছা বল তো! আমি তোমায় দেখেশুনে নিজের ইচ্ছেতেই তো বিয়ে করেছি, কারুর চাপে তো করি নি?’

“হ্যাঁ, স্ত্রী হিসাবে একটি মেয়ের দরকার ছিল বলেই তুমি আমার রূপ দেখে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলে। বিয়ে করলে যে স্ত্রীকে ভালবাসতেই হবে এমন কি কোন বাধ্যবাধকতা আছে?”

তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ ভানু। আগে তুমি কত ভাল ছিলে। এখন কত বদলে গেছ?’

“নিশ্চয়ই বদলে গেছি। যতদিন আমি চোখ থাকতেও দেখতে পাইনি, কাউকে সন্দেহ করিনি, তোমার সব কথা বিশ্বাস করেছি, তোমার সব ব্যবহার ঠিক ভেবেছি ততদিন ভালই ছিলাম, খুবই ভাল ছিলাম। কিন্তু এখন আর তুমি আমার কিছুই করতে পারবে না। না সুখী না দুঃখী। সব রকম সহ্য করবার জন্য আমি নিজেকে তৈরী করেছি। ভাঙ্গা কাঁচ কি কখনও জোড়া লাগে?

মন তো কাঁচের চেয়েও ঠুনকো। একবার ভাঙ্গল তো শেষ হয়ে গেল।'

"কিছুক্ষণ আমরা দু'জনেই চুপ করে রইলাম। তারপর উনি অন্তিমবাণ ছাড়লেন। বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার যেমন ইচ্ছে তাই হোক। কোনদিন যদি তোমার সুনজরে পড়তে পারি তবেই জানব আমি ভাগ্যবান।'

"আমি আশ্চর্য হয়ে শুধু এই ভাবছিলাম, কি করে কেউ নিজেকে এত ছোট করতে পারে।

'দয়া করে আর নীচু হয়ো না। যে পুরুষ স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, রক্ষণা-বেক্ষণ, ও শাসনের গর্ব করে সে কেমন করে স্ত্রীর কাছে হাত পাততে পারে? উল্টো কথা নয় কি? আমি স্ত্রী হলেও, মেয়েমানুষ তো। তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব বজায় রাখ, সেটাই আমি চাই।'

"এবার ওঁর চেহারার পরিবর্তন ঘটল। অহঙ্কারে আঘাত লাগাতে মিথ্যা বিনয়ের আবরণ খসে গেল আর চাপা রাগ বেরিয়ে পড়ল।

'তাহলে ও টাকাটার কি করবে? চীৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন।'

'যা ইচ্ছে তাই করব। কিছু না করতে পারলে পুড়িয়ে দেব, কিন্তু তোমায় . . .'

"হঠাৎ গালে যেন চড় পড়ল। চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে গেল। আমি পড়ে গেলাম।"

'ডটী ক্রীচর! এত অহঙ্কার! স্বামী হয়েও পায়ে ধরে চাইছে, তো তাকে উপদেশ শোনাতে এসেছেন? নোট পুড়িয়ে দেবে? তার সঙ্গে তুমিও পুড়ে ছাই হবে! আমিও দেখে নেব, এটাকা আমি কেমন ক'রে না পাই।'

'ও এই তোমার পরিবর্ত্তন?'

'চুপ কর, ভারী শাসন করতে এসেছেন।'

'না তো! তুমি নিজেই বলনি যে, একেবারে বদলে গেছ, আমার উপর অগাধ ভালবাসা। সেটাই দেখছিলাম।'

'তার দরকার নেই। সে সুযোগ তুমি নিজেই হারালে। আমি সবদিক থেকে বদলাবার চেষ্টা করেছিলাম তার তুমি কোন মূল্যই দিলে না। যদি আমি আরও কুপথে গিয়ে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কোনও বেশ্যা সঙ্গে নিয়ে এখানে আসি তো . . .'

'কি যা-তা বকছ তুমি? চোরের উপর রাগ ক'রে মাটিতে ভাত খাওয়া? জোর করে ক্ষমা পেতে চাও? কেউ কি অন্যকে খুশি করার জন্য ভালো হতে পারে?'

'বুঝেছি, তোমার সঙ্গে কথা বলাটাই ভুল হয়েছে। এই কি গৃহিণীর কর্ত্তব্য? তোমার স্বামী ঋণের ভারে নিপীড়িত, সে সময় তুমি গয়না পরে সাজতে চাও? যখন পাওনাদাররা সবাই মিলে তোমার স্বামীকে জেলে ঢোকাবে, তখন তুমি টাকার বিছানায় শুয়ে মজা ক'রে ঘুমোবে? এখন আক্কেল হবেনা তোমার। হবে সেদিন . . . যেদিন . . .'

"ওঁর সে সময়ের অবস্থা বোঝাই কি করে? একে বদরাগী, তার উপরে খেয়েছে মদ, তারপর পড়লো আগুনে পা, আর শেষে বিছের কামড়। অবস্থাটা কি, ভেবে নাও।"

"বাবাকে লিখে দিলাম টাকা ব্যাঙ্কে জমা করতে, বিট্টুকে পড়াতে লাগবে। কিন্তু চিঠিটা লেখবার পর আমার এত কান্না পেল যে কি বলবো?"

"দেখনা কি অঘটনই ঘটল। স্বামীর চেয়ে টাকাকে আমি বড় ক'রে দেখলাম। যে লোকটাকে পাওনাদাররা ছেঁকে ধরেছে, সব জায়গা থেকে নিরাশ হয়ে যে শেষে নির্লজ্জ হয়ে আমার সামনে হাত পাতল তাকে আমি তক্ষুনি প্রত্যাখান করলাম। কেন? আমাদের মধ্যে এতটুকু ভালবাসা থাকলে কি আমরা দু'জনেই পরস্পরের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতাম না? তা হলে কি আমি টাকার দিকে কখনও চেয়েও দেখতাম! বাপের যোগ্যতা থাকলে মাকে

কি ছেলেকে পড়াবার জন্য ভাবতে হত? হে ভগবান্! আমার দুঃখের কি অন্ত হবে না? আমার চোখের জলের কি কোনও দাম নেই? আমি কেঁদে আকুল হয়ে গেলাম। তখন থেকেই আমাদের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ, আজ তিনদিন হয়েছে।"

"হুঁঃ, এখানে এলেই আবার কিছু শুনতে হবে জানতাম, সেই ভয়েই আমি আসতে চাইছিলাম না। কিন্তু একটা কথা বলতো, জামাইবাবু যখন বললেন উনি একেবারে বদলে গেছেন তখন যদি তুমি টাকাটা ধার শোধ করতে দিয়ে দিতে তো কি ক্ষতি হত?"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? শুধু টাকাটা গাপ করার জন্য যে বদলেছে, তাকে বিশ্বাস করবো? তখন টাকা দেওয়ার মানেই হচ্ছে ওঁকে আরও প্রশ্রয় দেওয়া। ওঁর যে কি কি দোষ তা ওঁর জানা দরকার। আগে সত্যিকার অনুতাম তো হোক সে হলে আমি সব কিছু করতে রাজী।"

"ও, এবার আমিও বুঝতে পারলাম।"

হঠাৎ ভানু বলল, "কিছুদিনের মধ্যে একটা রেডিও কিনলে ভাল হয় না? এ ইচ্ছেটা আমার অনেক দিনকার।"

"একথা আমায় আগে বলনি কেন?"

"বলিনি। আমি তো জানতামই তুমি আমায় যেরকম ভালবাস, আমি কিছু চাইলেই দেবে। কিন্তু এ ভালবাসার দাম অনেক বেশী, একে ছোট করতে চাইনি, এর স্থান অনেক উঁচুতে।"

"ভানু তোমার সঙ্গে কথা বলতেই ভয় পাচ্ছি। তোমাকে বোঝা আমার অসাধ্য হয়ে উঠেছে।"

ভানু হাসল, "আর একটা কথা শুনবে?"

"সম্প্রতি একজন লেখিকা বেশ গল্প লিখতে আরম্ভ করেছেন। তুমিও বোধহয় জানো। ওঁর সব গল্পগুলোই কাল্পনিক। ওঁর গল্পের পাত্ররা সকলেই আদর্শ স্ত্রী-পুরুষ। বেশীর ভাগই দাম্পত্য-জীবনের গল্প। প্রত্যেক গল্পেই স্ত্রী-পুরুষের প্রেম, মমতা, অনুরাগ, অভিমানের অজস্র ধারা প্রবাহিত হচ্ছে। স্ত্রীর পায়ে কাঁটা ফুটলে

স্বামী অজ্ঞান হয়ে যান। স্বামীর মাথাব্যথা হলে স্ত্রী মূর্চ্ছা যান। দিনরাত্রি দু'জনেই সুখের নন্দন-কাননে বিচরণ করেন, সর্ব্বদাই ফুলের শয্যায় শয়ন করেন—যে-সে ফুল নয়, যুঁই, মল্লিকা, চামেলী। বাস্তব জগতকে ভুলিয়ে রাখে এমন বই পড়া মোটেই ভাল নয়। ওঁর গল্পে আমার এতটুকু আস্থা নেই তবুও ভাবলাম, হয়তো আমারই ধারণা ভুল। পতি পত্নীর ভালবাসা এ জগতে হয়না তা তো নয়। হতে পারে লেখিকা নিজের অনুভব থেকেই লিখছেন। এই জানবার জন্যই আমি ওঁকে চিঠি লিখি। 'আমি আপনার কতকগুলো গল্প পড়েছি। প্রত্যেক গল্পই অগাধ ভালবাসা, অসীম আনন্দে ভরা। তাই জানতে ইচ্ছে হচ্ছে বাস্তব জীবনে এর অনুভব করেছেন, না এরকম দাম্পত্য জীবনের শুধু কল্পনা করেছেন। সত্যি কথা লিখলে বাধিত হব।'

"উত্তর এলো। পড়ে হাসি পেল। লিখেছে, 'আমার গল্পগুলো বেশীর ভাগ কাল্পনিক। আমার পাড়ার অনেকের সঙ্গেই আমার জানাশুনা আছে। আমার কল্পনা থেকে আলাদা কিছু আমি কোথাও দেখিনি। আলাদা কিছু হতে পারে তাও আমি বিশ্বাস করিনা। আজকালকার লোকেরা খুবই নরম প্রকৃতির। ওঁদের ব্যবহারে কঠোরতা পাওয়া যায়না। যাই হোক, আমার রচনার আধার আমার নিজের অনুভব তো নয়। আমার এখনও বিয়ে হয়নি।'

'ওর চিঠির জবাবে আমি স্বস্তি পেলাম। ওর উপর দয়াও হলো। তাই আবার চিঠি দিলাম, 'অনুভবহীন লেখিকা বোন, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তুমি এখনও বঞ্চিত। তোমায় সে অভিজ্ঞতা দেবার ইচ্ছায় তোমায় শুভাকাঙ্খী হয়ে লিখছি। অন্ততঃ এখন সে কল্পনার আকাশ ছেড়ে এই বাস্তব পৃথিবীতে নেমে আসার চেষ্টা কর। তোমার কাল্পনিক রচনা পড়ে যারা এখনও সংসারে ঢোকেনি, যারা অনুভবহীন, তারা ভুল বুঝতে পারে। ভবিষ্যতে যখন তাদের কল্পনায় আঘাত লাগবে, তখন তোমার গল্পে তারা কোনও

সমাধান পাবে না, এমন অবস্থায় এ সব গল্পে কি কারুর কোনও লাভ হতে পারে? যেদিন তুমি বুঝবে তোমার কল্পনা শুধুই কল্পনা, তোমার স্বপ্ন সব মিথ্যে, তোমার আশা ক্ষণভঙ্গুর, তখন তোমার ব্যথা অসহ্য হয়ে উঠবে। নিজের জীবনে পরাজিত হয়ে যে সব কথা লিখছি তা একদিন তুমি নিজেই অনুভব করবে। এ সব জানার দরকার আরও বেশী, যেহেতু তুমি মেয়ে। লেখিকা হিসাবে তোমার একটি দায়িত্ব। বাস্তবকে লুকোবার চেষ্টা করো না কখনও। তোমার পাঠিকাদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করো না। এখন থেকেই যা রয়েছে তাই দেখার অভ্যাস করলে পরের অপ্রিয় পরিস্থিতিতে অত কষ্ট পেতে হবে না। এ সব আমার নিজের অনুভব দিয়ে বলছি বোন!"

ভানু হেসে জিজ্ঞাসা করল, "কেমন লাগলো?"

"খুব ভালো তো লাগল না। আমরা যা অনুভব করতে পারি না তা হতেই পারে না, এ ধারণা ভুল। পরিবারিক জীবনে সুখের আশা না থাকলে কেউই বিয়ে করতে চাইবে না। আমরা কত জনকেই বা জানি? ভানুমতীর বাড়ীর পাশেই তো সরোজা দেবীর সংসারটা রয়েছে। সব লোকেরই প্রকৃতি ভিন্ন। বল, ঠিক কি, না?"

ভানু কিছু না বলে শুধু হাসল।

যাক্ গে, ও কথা যেতে দাও। আমি স্নান করবো, তোয়ালে দাও তো ভানু! কথাবার্তা পরে হবে।" বলে উঠে গেলাম।

আমি স্নান ক'রে বেরুতে না বেরুতেই জামাইবাবু এসে গেলেন।

"কেমন আছেন জামাইবাবু?"

"হুঃ" বলে উনি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি খুব লজ্জা পেলাম। স্নানের ঘরে ঢুকে উনি তোয়ালে চাইলেন। ভানু আমার ব্যবহার করা ভিজে তেয়ালেটা নিয়ে ওঁকে দিল। নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তোয়ালেটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। বললেন, 'ভিজে তোয়ালে আমার গায়ে ফেলে দিলে? এতো দম্ভ? যত সব বাজে লোককে বাড়ীতে জুটিয়ে...এদের লজ্জাও নেই?'

আমি তো অবাক। লজ্জায় মাথা কাটা গেল? সমস্ত গর্ব খর্ব হয়ে গেল। আমার মুখের উপর আমায় গালি দিচ্ছে। আর এ বাড়ীতে থাকা নয়। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নিলাম। ওঁর ঘরের কাছে গিয়ে বললাম, "জামাইবাবু ক্ষমা করবেন, এতদিন ধরে আমার আসা যাওয়াতে আপনার খুব অসুবিধে হয়ে থাকবে। তবে এত অপদার্থ আমি নই যে কারুর বাড়ী গিয়ে নিজেকে যেচে অপমান করাই।"

বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"দাদা?"

চিন্তিত মুখে আমার দিকে চেয়ে ভানু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

"কিছু মনে করো না বোনটি। আমি যাচ্ছি।" বলেই বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় যেতে যেতে অসহ্য বেদনায় আমার চোখে জল এসে গেল। ভানুর জন্য কিছু করতেও পারলাম না, আর এখন তো ওর সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ হল। ওর থেকে একেবারে দূরে সরে যেতে হচ্ছে। জানি ভানুর খুব দুঃখ হবে, ও খুবই কাঁদবে। কিন্তু আমি নিরুপায়।

ভানুর স্বামী এই রাজশেখরম। একেই আমি কত উৎসাহে দেখতে গিয়েছিলাম বিয়ের সময়। ওর মধ্যে কি দেখেছিলাম যার জন্য আমার খুসির অন্ত ছিল না? আমাদের চোখ আর কতটুকু দেখতে পায়!

এক সপ্তাহ কেটে গেল। মন আমার খুব অস্থির ছিল। রাতে ভালো ক'রে ঘুম আসত না, খাওয়ায় কোনও রুচি ছিল না। সর্বদা ভানুর কথা ভেবে ভেবে কান্না পেত।

সেদিন রাতে ঘুম আসতে অনেক দেরী হল। একটা দুঃস্বপ্ন দেখলাম। ভানু হো হো ক'রে হাসছে। চমকে গেলাম। কোনও অজানা ভয় আমায় চেপে ধরলো। বোধহয় ভানু কাঁদছে। মাঝরাত...একলা। অন্ধকারে বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম। ইচ্ছে হল একবার গিয়ে দেখি। কিন্তু মাঝরাতে

ওখানে গেলে সে লোকটা কি ভাববে বলতে পারা যায় না। তবুও সাহস ক'রে সেই সময় চলে যেতাম তো বোধহয় ভানুকে বাঁচাতে পারতাম। আমি নিজের দোষেই ভানুকে হারালাম। হে ভগবান! আমার ভানু আমায় ছেড়ে চলে গেল। এ মা-মরা ছেলেটাকে আমি কি করে সামলাবো? ভানুর দুঃখের অবসান হল। অনন্ত সাগরের চির নবীন ধারায়, উদ্বেলিত তরঙ্গের মধ্যে কোথায়... প্রাণহীন ভানু...সবাইকে ভুলে শুয়ে রয়েছে। হায় আমার বোন রে!...

ভানুর ছেলেকে কাকীমার কোলে কি ক'রে দিলাম কিছুই মনে নেই। কাকীমা আছাড় খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। সারাবাড়ী শোকাচ্ছন্ন হয়ে গেল।

"ভানু! মা আমার!...তুই কি ভুলে গেলি তোর মা এখনও বসে? সেই মা, যে তোকে এত বড়টি করল। যাকে জন্ম দিয়েছিলাম সেই আমাকে ছেড়ে চলে গেল—একি কখনও ভেবেছিলাম। ভগবান! আমার এ বুকের জ্বালা কি কখনও জুড়োবে? কতো দুঃখ পেয়েছিস মাগো, একবারটিও যদি বলতিস, তোকে আমি সব দুঃখ-জ্বালা থেকে আড়াল ক'রে রাখতাম। এ দুধের বাছাকে আমার কাছে ফেলে গেলি। ভানুরে, আমি কি করবো, তুই কোথায় গেলি? তোকে আমি ভুলব কি করে?"

...কাকীমার আবার জ্ঞান হতেই, মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। শোকের জ্বালায় আমাকেও তিরস্কার করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেন আমি ভানুর অবস্থা ওঁকে বলিনি। একটু যদি বলতাম তো এ দুর্ঘটনা হত না। কথা ঠিকই—কাকীমাকে বলে দিলে এটা নাও হতে পারত। কিন্তু এখন আর কি করা যাবে?

সারাবাড়ী অন্ধকার হয়ে আছে। একটাও আলো কেউ জ্বালালো না। বাড়ী যেন শশ্মানপুরী এক ভানু ছাড়া সবাই রয়েছে। কাকীমা আবার কাঁদতে লাগলেন। চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে

গিয়ে ওঁর কাছে বসলাম। আমার হাত ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আমিও আর থাকতে পারলাম না, ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম।

"বাবা...কেশব! ভানু সত্যিই নেই? বেঁচে থাকার কোনও সম্ভাবনা নেই?"

"আমায় ক্ষমা করো কাকীমা। আমি ভাবতেই পারিনি ভানুর এত দুঃসাহস হতে পারে। আমাকে কথাও দিয়েছিল কখনও এমন কাজ করবে না বলে। ভেবেছিলাম চাকরী হলেই ভানুকে অন্য কোথাও নিয়ে যাব। কিন্তু এরি মধ্যে..."

ভানুর ছেলে আমাদের কাছে এল। ওকে জড়িয়ে ধরে কাকীমা আবার কেঁদে উঠলেন।

"কাকীমা, বিট্টুর জন্য তুমি চিন্তা করো না। ওর সব দায়িত্ব আমার। ওকে দেখাশোনা করা, পড়ানো সব ভার আমায় দিও। যতদূর পড়তে চাইবে তার ব্যবস্থা করে দেব। মা, বাপের অভাব দূর করব। আমার কথা বিশ্বাস করো কাকীমা।"

"তুমি তো এসব জানো না বাবা! পরের কথা এখন কি করে বলতে পারবে? ছেলে আমার ভার হবে না। যতদিন আমি বেঁচে আছি ওকে বুকে করে মানুষ করবো। তারপর কি হবে জানিনা..." বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। কাকীমা কেন ভয় পাচ্ছেন বুঝলাম। ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় পড়লে এমনই চিন্তা হয়। কিন্তু সুশীলা তো রয়েছে, সে ভানুর ছেলেকে ভানুর মতই ভালবাসবে। সুশীলার সঙ্গে আমার বিয়ে হলেই কাকীমার এ ভয়ও দূর হবে।

"কাকীমা, দরকার পড়ল বলেই বলছি। আমি ঠিক করেছি সুশীলাকেই বিয়ে করবো। সুশীলার উপর তো বিশ্বাস আছে?"

"কেশব......বাবা।" কাকীমা আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, "ভানুর খবর জানলে সুশীলা ভীষণ কষ্ট পাবে জানি। যেদিন ভানু শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিল, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে সারাদিন কেঁদেছিল। ওর কাছে তো আমার ছেলে খুব

আদরে থাকবে। আমার কোনো ভাবনাই থাকবে না। কিন্তু ভাবো তো বাছা, এই দুখের ছেলেটা কি পাপ করেছিল যে ওকে এত ভুগতে হচ্ছে?" কাকীমার আক্ষেপের অন্ত নেই, ভগবানের নামে আক্ষেপ ক'রে কেঁদেই চললেন।

আমি আশ্বস্ত হলাম। উঠে বাইরে গেলাম। অন্ধকারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতেই রাস্তায় সুশীলার সঙ্গে দেখা হল।

"সুশীলা" আমি বেশ সহজ হয়েই বললাম। ও থমকে দাঁড়াল। "ভানু তোমাকেও চিঠি দিয়েছে" বলে পকেট থেকে একটুকরো কাগজ বের করে ওকে দিলাম।

"ভানু...কি সত্যিই নেই আর?" সুশীলার আওয়াজ ভারী ছিল। "আমাকে তো কখনও কিছু বলেনি", বলে মাথা নীচু করে রইল।

চোখ মুছে বললাম, "হ্যাঁ সে তো আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু ভানু নেই বলাটা ঠিক হবেনা। ও নিশ্চয় কোথাও সুখেই আছে।"

"তুমি থাকা সত্ত্বেও এটা হল?"

"ঠিকই বলেছ তুমি। ভানুর কাছ থেকে কথা আদায় করা উচিত ছিল আমার, কিন্তু অতটা ভাবিনি। আমাকে ক্ষমা করো। তোমায় একটা কাজ করতে হবে কিন্তু,—কাজটা বেশ শক্ত, তবে করা খুবই দরকার। আজ থেকে উদয় তোমার ছেলে হল। এ দায়িত্ব আমাদের দু'জনের।"

মাথা তুলে আশ্চর্য্য হয়ে সে বলল, "জামাইবাবু..."

"আমি যা বলছি তা ঠিক। যাও, ভেতরে গিয়ে কাকীমাকে সান্ত্বনা দাও।"

আমি তাড়াতাড়ি নিচে নেমে, চিকু গাছের তলায় বসলাম। যে পাথরটার উপর বসে ভানু ও আমি গল্প করতাম, সেটা অমনিই পড়ে রয়েছে। আমি পাথরটার কাছে গেলাম। আদর করে হাত বুলিয়ে বললাম, "ভানু আর নেই।" ঝুঁকে পড়া চিকুর ডালকে বললাম, "তোর সই ভানু কাল রাত্তিরে মারা গেছে।" কুঁয়োর

কাছে বসে ওকেও আস্তে আস্তে বললাম, "ভানুকে মনে পড়ে? ও আর নেই। বেচারী . . . সমুদ্রে ভেসে . . . চলে গেছে।" অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল তাই ভাল ক'রে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, তবে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল প্রত্যেক গাছ, প্রত্যেক পাথর, প্রত্যেক প্রাণীকে ভানুর মৃত্যুসংবাদ শোনাই। আমি কাঁদতে পারছিলাম না। আমার হৃদয় যেন পাষাণ। বোধহয় আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি—নইলে কাঁদছি না কেন? অনেকক্ষণ পাথরটার উপর বসে রইলাম। ভানুর চিঠি এখন পর্যন্ত পড়া হয়নি। এতক্ষণ পড়বার ইচ্ছেও ছিলনা আর সময়ও পাইনি। কাল রাত্তিরে ভানু ছিল কিন্তু আজ নেই। তবে, লিখেছিল কি? ভিতরে ঢুকে বারান্দায় এক কোনে বসে সব চিঠিগুলো বের করলাম।

"দাদা, তোমাকে এরকম চিঠি লিখতে হবে কোনদিনও ভাবিনি। আমি যে কাজ করতে যাচ্ছি তাতে তোমার কষ্ট হবে, খুব ভাল করেই জানি। সব জেনেও আমি নিরুপায়। এ অভাবনীয় দিন আসবে আমিও চাইনি। শত দুঃখ-কষ্ট পেয়েও আমি বাঁচতেই চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম বিট্টুকে নিজের হাতে মানুষ করতে। দুঃসাহসী মনকে কতবার বোঝাতে চেয়েছি। উত্তেজিত হৃদয়কে শান্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু . . . দাদা! আমি বাঁচতেই চেয়েছিলাম, তবে এরকম অস্বাভাবিক জীবন চাইনি। এ অশান্ত, অসুখী দেহ-মনকে আর কত বোঝাতে পারব? মনকে ভুলিয়ে রাখার এ চেষ্টা কি যুগ-যুগান্তর ধরে চলবে? এ অসার, অপদার্থ জীবনকে কি জন্য, কার জন্য বাঁচিয়ে রাখবো?"

"এ বাড়ীতে আমরা যে দু'জন বাস করি তাদের মধ্যে কোনও আত্মীয়তা নেই। তারা আত্মীয় নয়, বন্ধু নয়, চেনা পরিচিতও নয়। ওরা একপথের পথিকও নয়। একজন অন্যজনের ঠিক উল্টো। ওরা একে অপরকে সর্ব্বদা ঘৃণা করে, হিংসা করে, দু'জনের মধ্যে কোন আকর্ষণ নেই। বিবাহের বেদীতে বসবার

আগে আমাদের মধ্যে যে দূরত্ব ছিল তা আজ হাজার গুণ বেড়ে গেছে। সেদিনের সব আশা আকাঙ্খা কোথায় তলিয়ে গেছে। তাদের এ ভাবে বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা মাত্র।"

"ত্থ'জনকে দৈহিক বন্ধনে বাঁধবার মানসিক বন্ধন আর নেই। জীবন প্রভাতে যে প্রেমবল্লরী প্রস্ফুটিত হয়েছিল সে এখন শুকিয়ে গেছে। পরস্পরকে বেঁধে রাখবার সব সুত্রই ছিন্ন হয়েছে। এখন এরা শুধু ত্থ'টো পাথর, কাছে এলেই ঠোকাঠুকি অনিবার্য। ঘুর্ণিপাকে পড়েছে যে নৌকা, সে যে কোনো সময়ই উল্টে যেতে পারে।"

"একবার তুমি বলেছিলে, 'এখন ছেলেই তোমার একমাত্র আশার কিরণ। কিন্তু তখন আমি মানতে পারিনি। মনের কথা মনেই রয়ে গিয়েছিল। যদি বলতাম ওঁকে আমি এখনো শুধরে নিতে পারব আশা আছে, তুমি উপহাস না ক'রে বসো, তাই আমার দ্বিধা ছিল। আমার মনের মণিকোঠায় তখনও একটি ক্ষীণ আশার রশ্মি যেন আমায় উৎসাহ দিত—সে সুদিন নিশ্চয় আসবে যখন উনি সম্পূর্ণ বদলে যাবেন, আর ওঁর স্ত্রী পুত্রের দায়িত্ব বোধ হবে।"

"তখন আমার বিশ্বাস ছিল, একবার রাস্তা হারালে সবাই কোনও না কোনোদিন আবার ঠিক রাস্তায় পৌছুবেই। মৃত্যুর পূর্বে মানুষের একবার নিজের দোষক্রটির হিসাব করতে হয়। না করাটাই অস্বাভাবিক। এরজন্য আমি যথেষ্ট প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু কিছুই হল না। হয়তো এ পরিবর্তন আসবেও যখন আমি এ ত্থনিয়ায় থাকব না। আমি জীবনে একটা মস্তবড় অপরাধ করেছি, যার কোনও প্রায়শ্চিত নেই। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, স্বামী সুন্দর বা অসুন্দর হোক, অন্ধ বা পঙ্গু হোক, তার যে দোষই থাকুক না কেন, ওঁকে ভালবেসে শ্রদ্ধা ক'রে ওঁর আদেশ পালন করাই স্ত্রীর কর্ত্তব্য। আমি শাস্ত্রের মতে চলিনি। শাস্ত্রও আমার দিকটা দেখেনি। স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি, ওঁকে সর্বস্ব সমর্পন ক'রে আমার জীবন সার্থক করতে পারিনি। এ নিশ্চয় আমার অপরাধ। মহাপণ্ডিত ধৰ্ম্মরাজ আমার বিচার করার সময় কৈফিয়ৎ চাইবেন বোধহয়।"

"আমার জীবন পিসিমার জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অতৃপ্তি নিয়ে সারাজীবন আমি কিন্তু থাকতে পারব না। তাতে আমার লক্ষ্যই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বাঁচতে গিয়ে যদি লক্ষ্যকেই হারাতে হয় তো তেমন বাঁচার দরকার কি? যেখানে মা-বাপের মধ্যে বনিবনা নেই, সেখানে ছেলের ভালো সংস্কার কি করে হতে পারে? সেইজন্যই আমার ইচ্ছে আমার ছেলে এমন জায়গায় লালিত পালিত হোক যেখানে শান্তি ও প্রেমের অভাব নেই। এরকম লক্ষ্য থাকলে কি আমায় মরে যাওয়াই উচিত নয়? কিন্তু যেহেতু তুমি আমায় ভালবাস, তাই তুমি বলবে এটা ভুল। আমাদের সমাজে এখনও স্ত্রী স্বাধীন ভাবে চাকরী ক'রে থাকতে পারে না। আমাদের তেমন প্রগতি হয়নি। এ ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই। একে তুমি যদি আবেগই বল, তো সেই আবেগই আমাকে মুক্তি দেবে।"

"বাঁচতেই যদি হয়, আমি আদরে সোহাগে বাঁচতে চাই। যে প্রেম দু'জনের মিলন ঘটাবে, যে প্রেম অপরের জীবনে নিজেকে বিলীন ক'রে দিতে পারবে এমন নির্মল প্রেম আমার আকাঙ্খার বস্তু। আসল জীবনই হলো এই। বাঁচতে হলে আমার এরকম জীবনই চাই।"

প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মেনে নেবার ধৈর্য্য আর আমার নেই। গোড়া থেকেই আমার দুর্বলতা এখানেই। আমার এ প্রকৃতি বোধহয় ভগবানেরই অভিশাপ। ভগবানও তো পুরুষই, না?"

"দাদা! আমার ছেলে বাপের ভালবাসাও পেলনা আর এখন মায়ের থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। ও কি জানে, দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে। আর ও মাকে কখনও দেখতে পাবে না। আমার যাবার পর ওর ঘুম ভাঙ্গবে, উঠে কান্না শুরু করে দেবে, বাপের নিদ্রার ব্যাঘাত হবে। উনি রেগে ওকে মারধোর করবেন···ঘরের বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন . . . অন্ধকারে ও কাঁদতে থাকবে। মা-মা বলে...ডাকবে...ভয়ে ককিয়ে উঠবে..."

"এই মাকে তুমি কত নিষ্ঠুর ক'রে দিলে ভগবান! মায়ের মনকে

পাষাণ ক'রে দিলে...আমার ছেলেটাকে তুমি নিজের কাছে নিয়ে যাবে তো ?...চোখের জলে সব অক্ষর ঝাপসা হয়ে গেল।"

দাদা! তুমি আছ, তাই আমার আর কোনও ভাবনা নেই। খবরটা জানলেই তুমি এসে বিট্টুকে নিয়ে যাবে। আমার মার কাছে ওকে পৌঁছে দেবে। কিন্তু কেশব দাদা, এর দায়িত্ব তোমার, আমার মার নয়। আমাব ছেলে আমি তোমাকেই সঁপে দিয়ে গেলাম। আমার মন-প্রাণ, আমার সর্বস্ব উদয় তোমারই কাছে রইল। তুমিই ওর মা, বাপ, ওর দেবতা সব কিছু। এক তোমারই উপর আমার আস্থা, নইলে আমি শান্তিতে মরতে পারব না।"

"বিট্টুর পড়াশোনার বিষয় আমি এই ঠিক করেছি, ও ডাক্তার হবে। বিলেতে গিয়ে পড়তে পায় যেন। এই আমার ইচ্ছে! কিন্তু ও যদি ডাক্তার হতে না চায় তাহলে জোর কর না। ওর যা ইচ্ছা, ও যা চায় তাই করতে দিও। যদি সেলাই শিখতে চায়, দর্জি হতে দিও, মাটির বাসন তৈরী করতে চায় তো কুমোর হতে দিও। কোনো কাজই খারাপ নয়। কিন্তু যে কাজ বেছে নেবে তা সুষ্ঠু রূপে করা চাই।"

"তারপর তোমার বিয়ের কথা। আমার ইচ্ছে তুমি সুশীলাকে বিয়ে কর। ও তোমাকেই চায়। এমন মেয়েকে বিয়ে করা খুব সৌভাগ্য। যখন থেকে ওর জ্ঞান হয়েছে তোমাকেই ও শ্রদ্ধা করে, তোমাকেই চায়। তুমি ওর কাছে ঋণী। সে ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া তোমার দায়িত্ব। এটা যদি না করো তো বলতে হবে তুমি অকৃতজ্ঞ।"

"জ্যাঠামশাই যে কত গোঁড়া সে আমি খুব ভাল করেই জানি। তাই তোমাকে এত সব বলে বোঝাচ্ছি। জীবনে টাকাই সব কিছু নয়। যাদের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে, তাদের মিলন হতে দেওয়াই পুণ্য, তাদের আলাদা করা পাপ। জ্যাঠামশাই যদি এ কথা বুঝতে পারেন ভালোই। তবুও তুমি হচ্ছ পুরুষ, তুমি স্বাধীন— তুমি নিজেই ভেবে দেখনা...মা-বাপের কথা সন্তানদের শোনা

উচিত কিন্তু নিজেকে একেবারে শেষ ক'রে নয়। বড়রা সম্মানের যোগ্য হন নিঃস্বার্থ হলেই। সুশীলা আর তুমি পরস্পরে জীবনকে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে পারবে। তোমাদের মত মা-বাপ পেলে... আমার উদয় ধন্য হবে। ও কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে—জানে, ওর মা ওর কাছেই আছে। আমার চোখের জল আর বাঁধা মানছে না। হাত আমার কাঁপছে, কলম ধরে রাখতে পারছি না, এবার শেষ করি...”

“আমি এ জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছি—এর দুঃখ, বেদনা, বিক্ষোভ সব থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছি। আজ আমার শুভদিন। দাদা, ইচ্ছে হচ্ছে একবার হা হা করে হেসে উঠি, খিল খিল ক'রে হাসি। এ জীবনে হেরে গেছি, তবে সেটা আমার অপমান নয়, পরাজয়। প্রত্যেক স্ত্রীর ভাগ্য আমার মত হবে না বোধহয়। তবে আজকের সমাজে হাজার হাজার ভানুমতী পড়ে আছে। এখন আমাদের সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে চলেছে। এরকম অবস্থায় একদিকে প্রগতি, অপরদিকে গোঁড়ামি থাকা স্বাভাবিক। যে স্ত্রীরা আজ প্রগতির পথে চলেছে তাদের সমাজের গোঁড়ামির সঙ্গে সংঘর্ষ করতেই হবে। শাসন করতে অভ্যস্ত পুরুষদের সঙ্গে নবজাগরিত স্ত্রীর বিদ্রোহ অনিবার্য। এ বেড়েই চলবে। যে ওর বিরুদ্ধে যাবে তাকে সুদ্ধু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। সেই শুভ দিনকে আহ্বান করবার উদ্দেশ্যেই ভানুমতীর মত কয়েকজন নারীকে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে হবে।”

“বিট্টুকেও একটা চিঠি লিখলাম। ওতে অনেক কিছু লিখেছি। চিঠিটা যত্ন ক'রে রেখো। বিট্টু যখন বড় হবে চিঠিটা দিও ওকে।”

“তাহলে আমি চললাম...বিট্টুর ঘুম ভেঙ্গে গেলে আর কিছু করতে পারব না।”

“তোমার ভালবাসার দান ঘড়িটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি। ও আমার অঙ্গাঙ্গীভূত। আমার সঙ্গে সঙ্গে সেও কত লাঞ্ছনা, অপমান

সহ্য করেছে। তোমার কাছে, আমার বিট্টুর কাছে আর সকলেরই কাছ থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

তোমার অভাগিনী বোন—ভানুমতী”।

চিঠিটা কোলে ফেলে হাঁটুতে মাথা গুঁজে আমি ফুঁপিয়ে উঠলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, ভানু আমার উপর একটা মস্ত দায়িত্ব দিয়ে গেছে। তার এই ইচ্ছেটাকে আমায় পূরণ করতেই হবে। এ তার ইচ্ছে নয়, এ তার আদেশ।

ভানু আমার চেয়ে ছোট ছিল, আমরা এক সঙ্গেই লেখাপড়া, হাসি গল্প, খাওয়া দাওয়া করেছি। খুশিতে দিন কাটিয়েছি। আমি যেমন ছিলাম তেমনই আছি। কিন্তু ভানুর এরিমধ্যে কত পরিবর্তন ঘটে গেল। বিয়ে হল, তারপর মা হল, আর আজ শেষও হয়ে গেল। আমার জীবনে এসবের কিছুই হয় নি। জীবনে ভানু যত না সুখ ও আনন্দ পেল তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃখ ও শোক পেল, যতই ভালবাসতে চাইল ততই পেল ধিক্কার, চাইল অনেক কিছু কিন্তু হারাল সব।

আমি রয়েছি, ভানু নেই। এরকম ভাবতে ভাবতে কোথায় যে কতক্ষণ বসেছিলাম মনেই ছিল না। বড়দি আমায় খুঁজে পেয়ে বলল, “কেশব, দেখো তো, ভানুর ছেলেটা খাচ্ছে না।” আমি তক্ষুনি উঠে গেলাম। বিট্টু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ‘মা···মা’ বলে কাঁদছে। ভীষণ কষ্ট হল। “বিট্টু আয়,” বলে কোলে তুলে নিলাম।

“মামাবাবু, মা কোথায়··· ?”

“মা এখুনি এসে যাবে। ততক্ষণ তুমি খেয়ে নাও তো! মা কত ভাল ভাল খেলনা, বেলুন সব আনবে। আমরা খেলব।”

“মা কোথায় গেছে ?”

“তুমি যখন ঘুমোচ্ছিলে, মা তখন গাঁয়ে গেছে ?”

“উঁঃ উঁঃ, আমাকে কেন নিয়ে গেল না ?”

তারপর একেবারে কেঁদে ফেলল। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল। ওকে বুকে চেপে ধরলাম।

"মা একটু পরেই এসে যাবে। ততক্ষণ আমাকে তোমার কাছে থাকতে বলে গেছে। মিথ্যে বলছি না বিট্টু, বুঝেছ তো? এসো এবার আমরা খাই।"

"তুমিও খাবে?"

"আমিও খাবো, তুমিও খাবে, দু'জনে এক থালায় খাব, কেমন?"

"তাহলে, আমার মা কোথায় খাবে?"

"মা তোমার...আত্মীয়দের দেখতে গাঁয়ে গেছে তো? ওরাই মাকে খাওয়াবে, ওখানেই খাবে।"

"দইও খাবে?"

"নিশ্চয়। দই, ঘি সব দেবে। তুমিও দই দিয়ে রুটি খাও বিট্টু।"

এক ঘণ্টা এভাবে জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে শেষে ও কিছু আশ্বস্ত হলো। একটু পরে মা এসে যাবে জেনে খেতেও রাজী হল। ভাত বাড়তে বাড়তে রাত দশটা হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা সবাই বিষণ্ণ হয়ে বসেছিল। আটটা নাগাদ পাড়ার একটি মহিলা এসে রান্না ক'রে গেলেন। বড়দি ছোটদের খেতে দিল।

বিট্টুর সঙ্গে আমায়ও একটু খেতে হল। খাইয়ে-দাইয়ে ওকে কোলে নিলাম। একটু বেড়াতেই ও ঘুমিয়ে পড়ল। ও ঘুমোবার পর আমি ভেতরে গেলাম।

মাঝরাত...বাড়ী যেন থমথম করছে। থেকে থেকে কাকীমা চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছেন। বুক ফাটা কান্না। ঘরে গিয়ে লাইট জ্বেলে যে চিঠিটা ভানু ছেলের নামে লিখেছিল বের করলাম। ভানুর কথাবার্তা শোনবার জন্য আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম। চিঠি দিয়েই কথা বলা যাক্। চিঠির কয়েক জায়গায় অক্ষরগুলো ঝাপসা দেখাচ্ছিল। চোখের জল মুছে চিঠিটা পড়তেই যাচ্ছি ইতিমধ্যে

বিট্‌টু ঘুম থেকে উঠে কাঁদতে লাগল! শশব্যস্ত হয়ে আমি ওর দিকে ছুটলাম। ওকে আবার কোলে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ঘুম পাড়ালাম।

কিন্তু জানিনা কেন চিঠিটা পড়বার আর ইচ্ছে হলো না। ছেলেকে ভানু চিঠিতে কি লিখে থাকবে কে জানে। বড় হয়ে গেলে চিঠিটা ও নিজেই পড়বে। কিন্তু মন খুব খারাপ হয়ে গেল।

ভানু...বোনটি, এতো দুঃখ আমি সহ্য করতে পারছি না যে ভানু। তোমার উপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। এ অবোধ শিশুটি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারে না, তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া কি তোমার উচিত ছিল? কখনো কি ভেবেছ যে নিজের স্বার্থ থেকে ত্যাগ অনেক বড়? তোমায় যারা ভালবাসে তাদের শুধু নিজের স্বার্থের জন্য অকূলে ভাসিয়ে গেলে? বেঁচে তুমি নিজে সুখী হতে পারতে না বুঝলাম, কিন্তু এ ভাইটিকে তো সুখী করতে পারতে? তাহলে আমাকেও তুমি স্বার্থপর বলতে পার। কিন্তু নিজের ছেলেকে তো নিজের দেখা উচিত ছিল। আমার উপর নির্ভর ক'রে তার ভার আমার উপর ছাড়া কি তোমার উচিত হয়েছে? একেবারেই উচিত হয় নি। সারাজীবন ধরে যদি তুমি শুধু তাসেরই প্রাসাদ নির্মাণ করলে আর সে সব এক এক ক'রে পড়ে গেল, তো দোষটা কার? তাকে তুমি তোমার মন্দ ভাগ্যই কেন মানতে পারলে না? কিন্তু যা কিছুই এখন বলি তুমি শুনতে পাবে না, আমি যতই কাঁদি তুমি ফিরে আসবে না!

"একি কেশব! তুমি কাঁদছ?"

"হ্যাঁ....না তো...এসো দিদি! দেখেছ, ভানু কিরকম কাজ...।"

"হ্যাঁ সত্যিই! কিরকম কাজ করেছে! চিঠিগুলোয় কি লিখেছে?"

"কোনও কারণ দেয়নি। কিছু তো নিশ্চয়ই হবে, যা বেচারী লিখতেই পারেনি। না হলে অন্ততঃ আমায় তো বলতই।"

দিদি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

"বিট্টু ঘুমোচ্ছে ?"

"ছটফট করছিল, আমি ঘুম পাড়িয়ে এদিকে এলাম। তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও না ?"

"বসি বা শুই একই কথা দিদি। ঘুম তো আসবে না। মনটাও বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে।"

"তোমার মত ভাই থাকা সত্ত্বেও বেচারী ভানু নিজেকে কি করে এত অভাগিনী মনে করল ? অন্ততঃ তোমার জন্যও ওর বেঁচে থাকা উচিত ছিল।"

"দুঃখ পাচ্ছি বলেই দিদি আমরা এরকম ভাবছি। কিন্তু ভানু যে অবস্থায় ছিল তাতে এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না, তা আমি জানি।"

কিছুক্ষণ এভাবের কথাবার্তার পর দিদি বিট্টুর কান্না শুনতে পেয়ে চলে গেলেন। আমি গিয়ে বিট্টুর পাশে শুয়ে পড়লাম। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ কিন্তু কারুরই চোখে ঘুম নেই।

সকাল হলো। বিট্টু আবার কান্না আরম্ভ করল। আবার ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ও আমার কথা বিশ্বাস করল না, কেন না ওর-ও বুদ্ধি হয়েছে।

আমাকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "মামা, তুমি বলেছিলে··· মা আসবে...আমার মা কোথায় ?"

"আসবে, আসবে বাবা! ওর আত্মীয়রা কি এত শীগ্‌গির ছাড়বে ? দু'তিন দিনের মধ্যে এসে পড়বে। ততদিন আমাদের খেলা করতে বলে গেছে।"

"না···না····আমি খেলব না। মামা...আমাকে মার কাছে নিয়ে চল।" বিট্টুর চোখে জল উপছে পড়ল। কি করা উচিত আমি কিছুই ভেবে পেলাম না। ও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেই চলেছে। আমার এড়িয়ে যাওয়া উত্তরে ও সন্তুষ্ট হচ্ছে না। ছোট-ছেলেদের সঙ্গেও বসছে না, আমাকে ছেড়ে আর কারুর কাছে যাচ্ছে না। কেবলই 'মা...ওমা' বলে করুণ স্বরে কাঁদছে।

সেদিন ভাল ক'রে খেলও না। রাত্তিরে আমার কাছে শোওয়ালাম, অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে শেষে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের মধ্যে বারবার চমকে উঠছে, কাঁদছে। কেউই বুঝতে পারছে না কি করে ওকে শান্ত করাবে। কাকীমা কোলে নিতে গেলেন তো তাড়াতাড়ি আমার বুকে মুখ লুকোলো। আমি বললাম, "না, না তোমায় কোথাও যেতে হবে না। চল তোমায় বাইরে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

জন্মের পর থেকেই কখনও একঘণ্টার জন্যও মা-ছাড়া হয়নি ও। বাপ থাকতেও সর্বদা মার কাছেই থাকত। ভীষণ ভালবাসত মাকে। আস্তে আস্তে এখন সব বুঝছে। নিজের মাকে কেমন করে ভুলতে পারে? মন আমার হাহাকার ক'রে উঠল। মার কথা ভেবে ভেবে ওর যদি কিছু হয়। যদি আরও কাহিল হয়ে যায়? তারপর ভাবলাম এখন তো শিশু, আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। কিন্তু সকালে যদি আবার কাঁদতে আরম্ভ করে তো কি হবে? সাবধানে বিছানায় শুইয়ে দিলাম।

আরও দু'দিন কাটল। বিট্টুর অস্থিরতা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। খাওয়া দাওয়া একেবারে ছেড়ে দিয়েছে। 'মা...মা' করে কেঁদেই চলেছে। বলছে, 'মাকে নিয়ে এস, নয় তো আমায় নিয়ে চল মার কাছে।'

কাকীমার কান্না দেখে আরও ভয় পেয়ে গেছে। ঘুমোতে ঘুমোতে চমকে উঠছে, হঠাৎ বসে পড়ে কাঁদছে, সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে, আবার নিরাশ হয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছে। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কাকীমা, দিদি সবাই ওকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ও কারুর কথাই বিশ্বাস করছিল না।

রাত্তিরে জ্বর এসে গেল বিট্টুর। আমি তখনই ডাক্তার ডেকে আনলাম। ইঞ্জেকশন দিয়ে ডাক্তার চলে গেলেন।

সকালে জ্বর কিছু কম ছিল। ও তখনও ঘুমোচ্ছিল। আমি মুখ হাত ধুয়ে ওর পাশে এসে বসলাম।

আস্তে করে ডাকলাম, "বিট্টু !"

ও আস্তে আস্তে চোখ খুলল।

"আম্মা ![১] আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমোচ্ছ।"

"মা...আসেনি ?"

ঐ যাঃ, ভুল হয়ে গেল। ওকে আবার মার কথা মনে করিয়ে দিলাম।

"মামাবাবু !"

"হ্যাঁ, একটু কফি খাবে বিট্টু ?"

"না, মা আমায় কখনও কফি দিত না।"

"আচ্ছা ঠিক, দুধ খাবে ?"

"না, খাবো না।"

"বড় ভাল ছেলে, একটু দুধ খাও, নিয়ে আসি ?"

"মার কাছে নিয়ে যাবে না ?" যদি হ্যাঁ বলি তো দুধ খেয়েই যেতে চাইবে। না বললে দুধও খাবে না। আমি চুপ করে রইলাম। ও কাঁদতে আরম্ভ করল। দেখে মন হাহাকার ক'রে উঠছে। বেচারা, এই বয়সেই মা হারালো। রাগ করে খাট থেকে নেমে দু'চার পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল। আবার কাঁদতে লাগল। মনে হচ্ছিল এ জগতে ওর কেউ নেই, একেবারে অনাথ, নিজের মন্দ ভাগ্যের জন্য নিরুপায় হয়ে শুধু কাঁদছে। কাকীমাও ওকে থামাতে পারছেন না। ওকে আবার জোর করে নিজের কাছে টেনে আনলাম। কেঁদে কেটে ও বেচারা আর কি করে—আমার কাছেই এল।

বিট্টুর জ্বর বেড়েই চলেছে। অজ্ঞান হয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে 'মা...মা' বলে ডেকে উঠছে। পাশের ঘরে ডাক্তার ইঞ্জেকশন ভরছিলেন।

---

[১] বাচ্চাদের আদর করে আম্মা বলে ডাকা হয়।

বাড়ীর সবাই বিট্টুর আশে-পাশে চুপচাপ বসেছিলেন। সকলের চেহারায় চিন্তা ও ভয়ের ছাপ। তক্ষুনি আমি ডাক্তারকে দেখতে উঠে গেলাম। উনি ইঞ্জেকশন নিয়ে এদিকেই আসছিলেন। বিহ্বল হয়ে 'ডাক্তারবাবু' বলেই আমি ওঁর হাত ধরে ফেললাম। আমার সমস্ত শরীর কাঁপছিল, আওয়াজ বেরুচ্ছিল না।

"ডাক্তারবাবু, আপনি কথা দিন, বিট্টুকে বাঁচাবেন।"

"স্থির হোন রাও সাহেব, আমি ভাল ওষুধ দিচ্ছি। আমার যা করার সবই করবো নিশ্চয়।"

"না ডাক্তারবাবু, বিট্টুকে বাঁচাতে পারবেন এটুকুও কি আপনি জোর ক'রে বলতে পারেন না? যদি বলেন তো, কোন বড় শহরের হাসপাতালে নিয়ে যাই।"

"দেখুন রাও সাহেব, ভয় পেয়ে হঠাৎ কিছু ক'রে ফেলবেন না। মার দুঃখ ছাড়া এর আর কোনও রোগ নেই। আমায় ডাক্তার না ভেবে নিজের ভাই মনে করুন। আমি ওকে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করবো।"

"ক্ষমা করবেন ডাক্তারবাবু, আমার যে কি দুঃখ তা জানেন না আপনি। এ ছেলেটাকে আমার হাতে দিয়ে আমার বোন আত্মহত্যা করেছে। যদি একে বাঁচাতে না পারি...ডাক্তার...আমি আর কি বলবো আপনাকে...ওকে বাঁচাতেই হবে।"

ডাক্তার আমায় এড়িয়ে বাইরে চলে গেলেন। আমিও তাঁর পেছনে দৌড়লাম। ইঞ্জেকশনের ব্যথায় বিট্টু চীৎকার করে উঠল। চোখ বন্ধ করে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ কাঁদল।

আস্তে আস্তে দিন শেষ হয়ে চারিদিকে অন্ধকার নামল। বিট্‌টুর খাটের পাশেই বসে রইলাম আমি। কাকীমাও আমার কাছে বসেছিলেন। চার পাঁচ দিন আমি ঘুমোতে পারি নি, বিট্টুর পাশেই শুয়ে পড়লাম। চোখ জুড়ে এল।

উঠোনটা অন্ধকার হয়ে আছে। কাকীমা আলো জ্বালান নি।

অন্ধকারেই সিঁড়ি দিয়ে কে যেন উপরে উঠছে। চলন-বলন সব ভানুর মত। আরও কাছে এসে গেল ভানু।

"ভানু!" বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। কাকীমা অঘোরে ঘুমোচ্ছিলেন। ভানু আরও কাছে এসে হাসতে লাগল। "তুমি রাগ করেছ, না? দেখছ, আমি চলে এসেছি বেঁচে গিয়ে। সমুদ্রের ঢেউ এর সঙ্গে আমি ভেসে যাচ্ছিলাম, একজন জেলে আমায় উদ্ধার করেছে। দুদিন আমি অজ্ঞান ছিলাম"—ও বলেই চলেছিল এরকম ভাবে আর আমি হাঁ করে চেয়েছিলাম।

"হায় রে, বিট্‌টুর জ্বর হয়েছে। বিট্টু! দেখ্ দেখ্ আমি এসে গেছি। আমার দিকে তাকা সোনা!" বিট্‌টুকে কোলে নিয়ে বুকে চেপে ধরলো ভানু। নিমেষের মধ্যে ওকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল...।

আমি পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলাম, "ভানু!"

"কেশব! বাবা কেশব!"

কে যেন আমাকে জাগাচ্ছিল। চমকে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে বসে পড়লাম। বিট্‌টু আমার কাছেই ঘুমিয়েছিল। আমি থর থর করে কাঁপছিলাম। কাকীমা আমার হাত সজোরে চেপে ধরেছিলেন।

"কাকীমা! তাহলে ভানু আসে নি!"

"......"

"কাকীমা, তুমিও ভানুকে দেখেছ, না?"

কাকীমা নীচুস্বরে বললেন, "বাবা তুমি স্বপ্ন দেখে থাকবে! ভানু আর কোত্থেকে আসবে? তেমন ভাগ্য আমাদের?"

"না কাকীমা, স্বপ্ন নয়। ভানুকে নিজের চোখে দেখেছি। বলছিল, কোনও জেলে ওকে বাঁচিয়েছে।"

"তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছ বাবা। হায় আমার মা-রে।" কাকীমা আবার কেঁদে উঠলেন।

বিট্‌টু চমকে গিয়ে ভয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজলো। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে ওকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। চোখের কোলে কালি পড়েছে, চোখ বসে গেছে। মাথায় চুল উস্কখুস্ক। পেট, পিঠ এক হয়ে গেছে। ভীষণ কষ্ট হলো আমার। যদি ভানু এসে ওকে এ অবস্থায় দেখে, সত্যিই যদি আসে...বিট্‌টুর এমন দশা হবে অনুমান করতে পারলে ও কি কখনই এ কাজ করতে পারতো ?

বাইরে অন্ধকারের দিকে শূণ্যদৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। এবার সত্যিই সিঁড়ি দিয়ে কেউ উঠছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে আলো জ্বালালাম। অবাক হয়ে গেলাম। এ যে জামাইবাবু, বিট্টুর বাপ। আশ্চর্য হয়ে গেলাম আমি। আমার কাছে এসে বিট্‌টুকে নিজের কোলে তুলে নিলেন। একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়েই রইলেন। ঝর ঝর ক'রে চোখের জল পড়তে লাগল। বিট্‌টুকে বুকে চেপে উনি কেঁদেই চললেন।

আমি অবাক হয়ে ওঁর দিকে চেয়ে রইলাম। জামাইবাবু কি বদলে গেছেন ? সত্যিই বদলেছেন ? কাকীমাও আমারই মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

কেউ কাউকে কিছু বলছে না। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ছেঁড়া কাপড়ে ওঁকে যেন ভিখারী বলে মনে হচ্ছিল। চোখ বসা। অমোঘ সত্যের স্পর্শের ভার ওঁর দেহ যেন আর বইতে পারছে না। উনি শুধু একদৃষ্টে নিজের ছেলের মুখের দিকে দেখছিলেন, যেন আর কারুর দিকে চাইবার সাহস নেই। ওঁর দৃষ্টিতে অনুতাপের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ....এ পরিবর্তন কি সত্যিকারের ? ভানু থাকলে কি বিশ্বাস করতো ?

বিট্টু চোখ মেলে তাকাল। পাগলের মত কিছুক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে রইল, তারপর চীৎকার ক'রে উঠল। বাপের কোল থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি দৌড়ে গেলাম। এরমধ্যে উনি আবার বিট্টুকে কোলে তুলতে যাচ্ছিলেন।

আমি আস্তে বললাম, "বিট্টু ভয় পেয়েছে, আমি নিচ্ছি।" উনি মাথা হেঁট করে মেঝেতে বসে পড়লেন। বিট্টু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে আমার কোলে শুইয়ে নিলাম।

'মা...মা...মা—'বলে ওর ঠোঁট নড়ে উ.ল। কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমি আমার হাতও নাড়তে পারছিলাম না। ওর চোখের চাউনী কি রকম, দেখবার চেষ্টা করলাম। চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে আসছে। পলক তোলবারও শক্তি নেই। ডাক্তার এলেন। ততক্ষণে বিট্টুর চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। উদয় অস্ত হল। ওর বাপ ওর মৃতদেহ বুকে আঁকড়ে কাঁদতে লাগল। কি অভাগা বাপ, ছেলে যখন খেলে বেড়াত একবার আদর ক'রে তাকে কাছেও ডাকেনি, চোখ তুলে তাকিয়েও দেখেনি।... "ভগবান আমায়ও ডেকে নাও। বোন, আমায় ক্ষমা করো। "আমার মাথায় পাথরের বোঝা চেপে... চোখের সামনে অন্ধকার। অনেকক্ষণ পরে উঠে.. ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভানুর ছেলেকে লেখা চিঠিটা বের করে পড়তে আরম্ভ করলাম:

"বিট্টু,

উদয়! আমার আয়ুষ্মান ছেলে! তোমাকে কি বলে সম্ভাষণ করবো? তিন বছরের ছোট ছেলেকে, ভাল ক'রে যে কথা বলতেও শেখেনি, পঁচিশ বছরের অনুভবী যুবক ভেবে চিঠি লিখতে বসেছি। তোমাকে কি লিখি আর কেমন ক'রে লিখি কিছুই বুঝতে পারছি না। বিট্টু! এই শেষ সময়ে আমি তোমায় কিছু বলতে চাই, তোমাকে অনেক কথা বোঝাতে চাই, আমার মনের কথা তোমায় খুলে বলতে চাইছি। এরজন্য আমার মন উতলা হয়েছে। তোমার কাছে, তোমার বিছানায় এখন আমি বসে আছি। এখন তুমি গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে তোমার মুখে যে হাসি খেলে যাচ্ছে তা দেখে তোমায় চুমু খাবার খুব ইচ্ছে করছে। কিন্তু এখন তা করতে পারিনা। একটু কিছুতেই তোমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। এ

সময় তুমি জেগে গেলে আমি কিছু করতে পারব না। তুমি করতেও দেবে না।”

“বিটটু! তোমার মা...আর . . . থাকবে না। তুমি উঠেই কাঁদবে। তোমার শিশুমন আকুল হয়ে উঠবে। সবার চেহারার মধ্যে নিজের মাকে খুঁজবে। যতদিন যাবে তোমার কোমল মন মাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে উঠবে। তোমার যে কি কষ্ট কাউকে বলতে পারবে না। নিরুপায় হয়ে কেঁদে উঠবে। জানি, তোমার কচি মনকে কতবড় আঘাত দিচ্ছি। আমাকে এরজন্য তুমি ক্ষমা করবে বিটটু? ভেবে দেখো বাবা, পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে কত কষ্ট পাই। যে শরীরকে আমরা এত যত্ন করি, তাকে নিজের হাতে জ্বালিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া, সমুদ্রের তীরে গিয়ে তার জলে নিজেকে ফেলে দেওয়া, নিজের হাতে গলায় দড়ি দিয়ে প্রাণ দেওয়া আর নিজেই নিজেকে ঘেন্না করা—এসবের পেছনে খুব বড় কারণ থাকা চাই, না? তুমি যদি এটা মনশ্চক্ষে দেখতে পাও, তো তুমি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করবে। বিটটু! তুমি আমায় ক্ষমা করবে?”

“যে মুহূর্তে আমি জেনেছিলাম তুমি আমার গর্ভে এসেছো, সে যে আমার কি অপূর্ব অনুভূতি তা আমি বলতে অক্ষম। আমায় মাতৃত্বের গৌরব দিয়েছিলে তুমি, চিরায়ু হও বাবা আমার! যেদিন তোমার জন্ম হল সেদিন সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিলাম। যখন তুমি চোখও খোলনি তোমাকে বুকে চেপে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই তুমি এলে, তাই তোমার নাম উদয় রাখলাম। এই একটি মাত্র কাজ আমার জীবনে নিজের ইচ্ছেয় করেছি। আমাকে এ কাজে কেউ বাধা দেয়নি, তার দুটোই মানে হতে পারে—আরেক জনেরও এটা মনঃপুত হয়েছিল, নয়তো এ নিয়ে ওর কোনো আগ্রহই ছিলনা। তোমার নামকরণটা এ দু'য়ের কোনটা ছিল তুমিই ভেবে নাও।

“তোমার কাছে আমি অনেক আশা করেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাদের বাড়ী তুমি আনন্দে ভরে দেবে, অন্ধকারে আলো

দেখাবে, তোমার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে দেবে....আর....যদি আমি বেঁচে থাকতাম তো আরও কত আশা পূরণ করতে। কিন্তু বিট্টু, আর বাঁচা আমার ভাগ্যে নেই। এ নিয়ে আমার আর কোনও আক্ষেপ নেই। আমার ভাবনা, দুঃখ, অভিমান সব ঘুচে গেছে।"

"কিন্তু আমার শেষ ইচ্ছা তোমায় বলছি। যে ইচ্ছা তুমি পূর্ণ করতে পারবে। তোমার জীবন গৌরবময় হোক, তুমি প্রগতিশীল ও প্রতিষ্ঠিত হও। তোমাকে আদর্শ পুরুষ হতে হবে। তোমাদের পুরুষ সমাজের অন্ধকারকে তুমি আলোকিত করবে, অন্যায়, অত্যাচার, অভদ্রতা এসবের উর্দ্ধে উঠে তোমার ব্যক্তিত্ব, পবিত্র ও উজ্জ্বল হবে। তুমি ভাবছ, এটাতো নিতান্ত সাধারণ কথা। মামাবাবুর সঙ্গে থেকে এতোদিনে তুমি এসবের অধিকারী হয়েছো নিশ্চয়। আমি ঠিক বলছি না?"

"কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যা তোমাকে বোঝাতে চাই সেটা হল, এই বিশাল জগতের সৃষ্টি ও পালন যে কেউ করুক না কেন—তাকে ভগবানই বলো বা আর কোনও বিরাট শক্তি—প্রকৃতির সব প্রাণীই সমান। হাতি বড়, পিপড়ে ছোট। কিন্তু প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আলাদা। পিঁপড়েতে কোনও নিকৃষ্টতা নেই, হাতিতে কোনও উৎকৃষ্টতা নেই। এ তত্ত্বটা তোমায় ভাল করে বুঝতে হবে।"

"মানুষ সবচেয়ে উচ্চ কোটির প্রাণী। সে ভাবতেও পারে, বুঝতেও পারে আর সেই মত ব্যবহারও করতে পারে। এ বিশিষ্টতা শুধু মানুষের, পশুপক্ষীর বা অন্য প্রাণীর নেই। সেইজন্য মানুষকে নিজের মনুষ্যত্ব ও বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে হবে। জন্তুদের মধ্যে খাবার নিয়ে মায়ে ছেলেতে কাড়াকাড়ি করছে। মার সঙ্গে তার সন্তান বড় হলে সহবাস করে। এতে ওদের কোনো দোষ নেই। ভগবান ওদের মনে বিচার শক্তি দেন নি। কিন্তু মানুষ যদি সব জানা সত্ত্বেও নিজের অধিকারে মত্ত থাকে, অন্যায়-অত্যাচার করেই সুখ

পায়, নীচ ব্যবহারে লজ্জা বোধ করে না—তবু সে পশুই। তুমি মনুষ্য জন্ম লাভ করেছ। মানুষ হয়েই তোমায় বাঁচতে ও মরতে হবে।"

"তোমার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হলে, যখন তুমি তোমার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন পরের ব্যক্তিত্বকে তুমি বুঝতে পারবে আর সম্মানও করবে।"

"আমার বিষয় মামাবাবুর কাছে অনেক কথা শুনে থাকবে। আমি এখনকার সামাজিক জীবনের অযোগ্য। পুরুষের নিরঙ্কুশ শাসনে থাকতে আমি অক্ষম। অসহায় নারী জীবন নিয়ে আমি থাকতে চাই না। তাই আমি সরে যাচ্ছি।"

"আবার কখনও—অনেক পুরুষানুক্রমে যখন পুরুষরা স্ত্রীকে সম্মান দেবে—যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম হবে, যখন পুরুষের অধিকার লিপ্সা শেষ হবে, যখন গোঁড়ামি সমূলে নির্মূল হবে, যখন আপন-পর কেউ থাকবে না, ছোট বড়র তফাৎ ঘুচে যাবে, যখন প্রত্যেক বাড়ী শান্তির আলয় হবে আর প্রত্যেক স্ত্রীর মন আনন্দে পরিপূর্ণ থাকবে, সবাই যখন মানুষ হয়ে বাঁচবে—তখন আমি আবার স্ত্রী হয়ে জন্মাতে চাই। এসব উপলব্ধি করার জন্য তোমার মত লক্ষ লক্ষ ছেলের চেষ্টা করতে হবে, আর দরকার হলে নিজের জীবনও উৎসর্গ করতে হবে।"

"বিট্টু! জীবনের অর্থই হল আনন্দ পাওয়া, নিজেকে এ ভাবে শেষ করা নয়। কিন্তু শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্যই বেঁচে থাকা যথেষ্ট নয়। মনই হচ্ছে মানব শরীরের সব চেয়ে সূক্ষ্ম যন্ত্র। তার ক্ষতি হলে মেসিন আর চলে না।"

"একটা কথা বললে তুমি তোমার মায়ের স্বভাব কি রকম বুঝতে পারবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, একবার মা আমার বিনুনীতে গোঁজবার জন্য, সোনার পাখিটা এনে জানলায় রেখেছিলেন। এরি-মধ্যে ছোট বোনের কান্না শুনে ওকে দুধ খাওয়াতে চলে গেলেন। আমিও এলো চুলেই বাইরে খেলতে চলে গেলাম। পরে মার

ওটির কথা মনে পড়লো। জানলার কাছে গিয়ে দেখলেন ওটা নেই। বুকটা ধড়াস করে উঠল। বাবা যখন জানতে পারলেন শুধু হাসলেন কিছু বললেন না। তারপরে মা আর কখনও কিছু হারায় নি। এমন ভালবাসার মধ্যে পালিত হয়েছিলাম। তাই বিয়ের পর চার বছরই বাঁচতে পারলাম। আজ পর্যন্ত জীবনে শুধু দুঃখ কষ্ট, ভয়, নিরাশাই পেলাম।"

"আমি নেই বলে তুমি ভেব না। আরেক জন স্ত্রী যাতে বাঁচতে পারে তার চেষ্টা করো। আমার কান্নায় কান দিও না কিন্তু অন্যকে কাঁদিও না। আমি সারা জীবন পরাধীন রইলাম বলে উত্তেজিত হয়ো না কিন্তু তুমি নিজে কারুর স্বাধীনতা কেড়ো না। আমার দুঃখময় জীবনের কথা ভেবে লজ্জা পেও না কিন্তু তোমার ভয়ে যেন কাউকে ভীত হয়ে না থাকতে হয়। তবেই তুমি মানুষ।"

"আজকের নারী যে অধিকার থেকে বঞ্চিত, পরে যাতে সে অধিকার সে ফিরে পায় তার জন্যে চেষ্টা করো। স্ত্রী জাতির পরিবর্তনের গতি তুমি বাড়াও। তবেই তুমি সমাজ সংস্কারক বলে গণ্য হবে।"

"বাবা আমার! আমার মনের সব কথাই তোমায় বললাম। এবার শেষ করছি। বিটটু, আজ তুমি এতো ঘুমোচ্ছ কেন? আমার দুঃসাহসে কি তুমিও সহয়তা করছো? উদয়, তোমায় ছেড়ে যেতে প্রাণ চাইছে না একেবারে। কিন্তু আর তো কোন উপায়ই নেই বাবা! ...যেতে দাও আমায়। ...তুমি তোমার মামার সঙ্গে সুখে থাক। ...তাহলে চলি?"

"আমার বড় আদরের ধন রে...তোমায় আশীর্বাদ করছি। মা হিসাবে তোমায় একটা আদেশ দিচ্ছি—তোমার জীবনদাতার উপর কখনও রাগ করো না। আমার কথা অবহেলা করবে না জানি।

স্নেহময়ী মা।"

আমি আর সামলাতে পারলাম না। দুঃখে অভিভূত হয়ে জামাইবাবুর কোলে চিঠিটা ফেলে বললাম, "নাও, চিঠিটা পড়ে

নাও। তোমার ছেলের নামে ভানুর লেখা চিঠি।” চিঠি খুলতে গিয়ে ওঁর হাত কাঁপছিল, পড়ে মাথা নিচু করে রইলেন।

বিট্টুর সঙ্গে সঙ্গে ও চিঠিটাও মাটিতে পুঁতে দিলাম।

তাহলে কি ভানু শুধু তাসেরই প্রাসাদ তৈরী করেছিল? মানুষকে সত্যিকার মানুষ ক'রে তুলতে চাইল, সে কি তার ভুল? পড়বার আকাঙ্খাকে পূর্ণ না করতে পেরে, সে যদি তার বিবাহিত জীবনকেই সফল করতে চাইল, সেও কি তার ভুল? পত্নী ও গৃহিণীরূপে নিজেকে যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, সে কি তার দুরাকাঙ্খা মাত্র? স্ত্রী ও মায়ের রূপে যে নির্মল আদর্শ সামনে রেখে ছেলেকে নিজের হাতে মানুষ ক'রে যোগ্য করে তোলবার তার যে চেষ্টা, তা কি সময়োপযোগী ছিল না?

অনেক ভেবেচিন্তেও এর কোনো উত্তর পাচ্ছি না। তাহলে, ভানু তার জীবনে পরাজিত হল কেন? পদে পদে দুঃখই বা কেন পেল? ভানু যেসব মহান আদর্শকে তার সামনে রেখেছিল, বাস্তব জীবনে তা শুধু তাসের প্রাসাদ হয়ে রয়ে গেল কেন? এটা ওর দুর্ভাগ্য বা কর্মফল বলেই বা কেন স্বীকার করতে হল?

তবে এখন বুঝতে পারছি এর কারণটা কি! ভানু যে ভারতবর্ষে মেয়ে হয়ে জন্মেছিল!

অন্তর্ভারতীয় পুস্তক-মালার অন্যান্য বই

১। গঙ্গা চিলোনির পাখি—(অসমিয়া উপন্যাস)
লেখক—অধ্যাপক লক্ষ্মী নন্দন বোরা।

২। মানবেণী ভাবাই—(গুজরাটী ভাষায় সামাজিক উপন্যাস)
লেখক—শ্রী পান্নালাল প্যাটেল।

৩। ভূলে বিশ্র চিত্র—(হিন্দি ভাষায় সামাজিক উপন্যাস)
লেখক—ভগবতী চরণ শর্মা।

৪। কথা ভারতী (হিন্দি)—(হিন্দি গল্পের সংকলন) সংগ্রন্থনা—
ডঃ নামভার সিং।

৫। চিকভীর রাজেন্দ্র—(কানাড়া ভাষায় ঐতিহাসিক উপন্যাস)
লেখক—মস্তি ভেঙ্কটেশ্ব আয়েঙ্গার।

৬। আলিদা মেলে—(কানাড়া ভাষায় সামাজিক উপন্যাস)
লেখক—শ্রী শিবরাম করণয়।

৭। বাল্যয়িয়া সাকী
পাত্তুমেয়ুর আড়ু } (মালয়ালম ভাষায় দু'টি উপন্যাস)
লেখক—বইকম মহম্মদ বশির। একই সঙ্গে প্রকাশিত হবে।

৮। নাল কেটু—(মালয়ালম ভাষায় আর একটি উপন্যাস)
লেখক—শ্রী এম. টি. বাসুদেবন নায়ার।

৯। কথা ভারতী—মালয়ালম (ছোট গল্পের সংকলন) সংগ্রন্থনা—
শ্রী ওমচেরী এন. এন. পিল্লে।

১০। বাঙ্গারওয়াড়ি—(মারাঠী উপন্যাস)
লেখক—শ্রী ভেঙ্কটেশ মাডগুলকর এতে চিত্রবহুল ভাষায় গ্রাম্য-জীবন তুলে ধরেছেন।

১১। মী—(মারাঠী উপন্যাস)
লেখক—শ্রী এইচ. এন. আপ্তে।
সম্পাদনা—শ্রী অনন্ত কানেকর।

১২। ব্রাহ্মণ কন্যা—(মারাঠী উপন্যাস)
—স্বর্গীয় ডঃ কেটকর।
সম্পাদনা—শ্রীমতী কৃষ্ণাভাই মোটে।

১৩। কথা পাঞ্জাব—পাঞ্জাবী আধুনিক ছোট গল্পের সংকলন।
সংগ্রন্থনা—ডঃ হরভজন সিং।

১৪। চিত্তা লাহু—(পাঞ্জাবী উপন্যাস)
লেখক—সর্দার নানক সিং।

১৫। কথা ভারতী (তামিল)—(তামিল ছোট গল্পের সংকলন)
—সংগ্রন্থনা শ্রী মি. পা. সোমাসুন্দরম।

১৬। আগ কা দরিয়া—(উর্দু ভাষায় উপন্যাস)
লেখিকা—কুমারী কুড়াতুলাইন হায়দর। এতে চিন্তার খোরাক আছে।

১৭। গুজাস্তা লক্ষ্ণৌই—উর্দু ক্লাসিক। এতে আছে প্রাচীন লক্ষ্ণৌর ঐতিহ্যময় অতীতের বিবরণ, লিখেছেন—স্যারার।

এই বইগুলি সর্বভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে।

এই পুস্তক-মালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো, ভারতবর্ষের প্রত্যেক ভাষার উৎকৃষ্ট ও লোকপ্রিয় পুস্তকগুলির অন্যান্য সমস্ত ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করা। যে প্রদেশের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হবে তার থেকে অন্যান্য প্রদেশের পাঠকরা ঐ প্রদেশের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সুখ-দুঃখ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এখনকার সমসাময়িক সাহিত্যগুলি থেকে বইগুলি বাছাই করা হচ্ছে।

আমাদের ভাষা রকমারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক চিন্তাধারার বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নেই বললেই চলে; আমাদের এদিকে বিশেষ দৃষ্টিও নেই। য়ুরোপেও ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন ভাষা রয়েছে, কিন্তু তাঁরা সাহিত্যিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে আদান প্রদান ক'রে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন।

আশা করা যায় এই আদান-প্রদানের মাধ্যমে আমা[redacted] ভাষাভাষি মানুষ একে অন্যের কাছাকাছি আসবার সুযো[redacted] একে অপরকে ভালো করে বুঝতে পারবেন, ফলে ভারতী[redacted] সুযোগ হবে।